বসন্তকুমারী।

(জীবনী)।

কলিকাতা সিটিকলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের
প্রধান অধ্যাপক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বিদ্যাভূষণ

বি, এ, (কলিকাতা), এম, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)

কর্ত্তৃক গ্রথিত।

১৩২৫

কলিকাতা।

উৎসর্গপত্র

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

শ্রীশ্রীপাদপঙ্কজেষু

মেজদাদা,

আপনি বাল্যাবধি আমাকে নিতান্ত স্নেহ করিয়া থাকেন। আপনার অপার স্নেহ ও অনুগ্রহের কোনও প্রতিদান নাই। আজ পরম পূজনীয়া স্বর্গগতা পুণ্যময়ী মেজবৌদিদির এই ক্ষুদ্র জীবনীখানি লইয়া আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। আমি জানি এই জীবনীখানি শতশত ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ হইলেও, জগতের অনন্ত রত্নভাণ্ডার অপেক্ষা আপনার প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী হইবে। তাই সাহস করিয়া উৎসর্গ করিতেছি।

সেবক

উপেন্দ্র।



বসন্তকুমারীর মৃত্যুর ৯ মাস পূর্ব্বের ফটো

বসন্তকুমারী।

(জীবনী)

সূচনা।

আমরা সাধারণতঃ বড় উপন্যাসে অনুরক্ত। উপন্যাসের কল্পিত চরিত্রগুলির সুখে দুঃখে আমাদের ললিতচিত্তবৃত্তিগুলি যার-পর-নাই আকৃষ্ট ও মোহিত হয়; এমন কি, আমরা সংসারের সব কাজ-কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া উহাদের বিষয় লইয়া অনন্যমনা হইয়া থাকি। ইহার কারণ খুঁজিতে অনেক দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের দেশে বাস্তব জীবনী একরূপ নাই বলিয়াই আমরা কল্পিত জীবন লইয়া এত বিব্রত। আজ-কালকার ইতিহাসগুলি প্রকৃতঘটনা বিবৃত করিলেও উহারা রক্তমাংস-বর্জ্জিত শুষ্ক অস্থিরাশি মাত্র। উহাদের মধ্যে সুরস জীবন-সমাবেশের অভাবে কেহই উহাদের আলোচনা করিতে চাহে না। উপন্যাসের মত রক্তমাংসময় সজীব জীবনী ইতিহাসে পাইলে কেহই উহা ছাড়িয়া উপন্যাস স্পর্শও করিত না, কেন না প্রকৃত পাইলে কে অপ্রকৃত স্বপ্নভাবময় ছায়ার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়? ইতিহাসে আবার জাতীয় জীবন, উত্থান-পতন, সমাজ-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি কতগুলি নীরস কঠোর বিষয়ের বিশ্লেষণ থাকে, সুতরাং উহা পাঠ করিবার অধিকারী হইবার পূর্ব্বে সহজ

প্রাণস্পর্শী ব্যক্তিগত জীবনী সমালোচনা বড়ই উপাদেয়; বিশেষতঃ যাঁহাদের আমরা জানি, যাঁহারা আমাদের মধ্যে থাকিয়া সংসারের সুখ-দুঃখে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, হঠাৎ একদিন কোথায়, কোন অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গিয়াছেন, আমরা জীবন বিনিময়েও আর যাঁহাদের দেখিতে পাই না, অথচ প্রাণ যাঁহাদের জন্য প্রতিপলে আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে, তাঁহাদের যদি একখানি জীবনী পাই, এমন কি কেহ যদি দয়া করিয়া কোথায়ও তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলেন, এক ফোটা চোখের জল ফেলেন, তাহা আমাদের বড়ই প্রাণস্পর্শী, বড়ই চিত্ত-বিমোহন। আমরা অনন্য-কর্ম্মা হইয়া তাহাতেই প্রাণ মন সঁপিয়া দি। তাই সুশিক্ষিত দেশমাত্রেই পরিবারমধ্যে কাহারও পরলোক প্রাপ্তি হইলে আত্মীয়গণ তাঁহার জীবনী, এমন কি তাঁহার সম্বন্ধে প্রাণের উচ্ছ্বাসময় কবিতা, লিখিয়া আপনাদিগের মধ্যে স্বর্গগত আত্মাকে চিরদিনের জন্য অক্ষয়, অমর করিয়া রাখেন।

কোনও আত্মীয়ের জীবনীপাঠও আমাদের শোকের সান্ত্বনা, নৈরাশ্যের আশা-সঞ্চার, দারুণ অন্তর্দাহের সুশীতল সুধাপ্রলেপ, জীবনযাপনের একমাত্র সহচর। কেবল যে সুবিখ্যাত কীর্ত্তিময় আদর্শ চরিত্রেরই জীবনী লিখিতে হইবে, পরিবারস্থ আর কাহারও জীবনী লেখনীয় নহে তাহা নহে; প্রিয়জন মাত্রেরই জীবনী প্রিয়জনের নিকটে বড়ই আদরের, বড়ই অমূল্য। সর্ব্বোপরি জীবনীপাঠের আর একটি বিশেষ অবান্তর ফল আছে, তাহা কাহারও উপেক্ষণীয় নহে। একখানি জীবনী দর্পণে প্রতি-বিম্বিত একখানি জীবন্ত চিত্র। উহা বিষম সংসারসমরে নব যাত্রীর একটি প্রধান চালক ও উপদেষ্টা। যে জীবনী অতীত তাহাতে প্রতিপদে নবীন জীবনের অশেষ শিক্ষার বিষয় রহিয়াছে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে অতীত সংসারী কিরূপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি ফল পাইয়াছেন, কোথায় পদস্খলন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কোথায় জীবন কেবল সুখময়, এরূপ নানাকথা বাস্তবজীবনী পাঠে নবপাঠক পদে-পদে

শিক্ষা পাইয়া থাকে। তাই যাহারই হউক না কেন, বাস্তব জীবনী সকলেরই পাঠ্য।

যাঁহার জীবনী আমরা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি একজন সাবিত্রী, সীতা কিংবা দময়ন্তী না হইলেও আমাদের বঙ্গ ললনাদের মধ্যে একজন বিশিষ্টগুণবতী নারী ছিলেন এবং তাঁহার জীবনী তাঁহার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়গণ ও সর্ব্বোপরি তাঁহার পতির বড়ই আদরের হইবে, অন্ততঃ তাঁহাদের নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবে, ইহা মনে করিয়া আমাদের নিতান্ত অক্ষমতাসত্ত্বেও লেখনী স্বতই প্রবর্ত্তিত হইল। বস্তুতঃ স্বর্গগতা বসন্তকুমারী লীলাবতী কিংবা মৈত্রেয়ীর ন্যায় বিদুষী না হইলেও মূর্খ কিংবা অশিক্ষিত ছিলেন না। সংস্কৃত কিংবা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল না বটে, কিন্তু নানা ভাষার সুগ্রন্থাবলী পাঠে মানব-হৃদয়ের যে প্রশস্ততা, সহানুভূতি, অভিজ্ঞতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সর্ব্বোপরি যে ধর্ম্মপ্রাণতা জাগরূক হয়, তাঁহার হৃদয়ে সে সকল গুণ প্রায় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি শৈশব হইতে আজীবন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মদালসা প্রভৃতি আর্য্যরমণীরত্নদিগকে আদর্শ মনে করিয়া নীরবে নিরাড়ম্বরে জীবনযাত্রা যাপন করিয়া গিয়াছেন। কেবল যাঁহারা তাঁহার নিতান্ত আত্মীয় ও সংসারাঙ্গনের সঙ্গী ছিলেন তাঁহারাই তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইতেন ও সেই মহীয়সী শক্তিময়ীর প্রতি ভক্তিবশতঃ প্রণত হইতেন।

বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের মহিলাদিগের জীবনী বাস্তবিকই অপূর্ব্ব রহস্যময়। প্রায় প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুললনার জীবনই উপন্যাসরহস্যে সমাবৃত। কেহই তাহা বড় লক্ষ্য করে না। মরু-প্রান্তরে বিকসিত কুসুমের ন্যায় বঙ্গীয় হিন্দুললনা নীরবে জগতের অপ্রত্যক্ষে গৃহকোণে উদিত হয়, আবার সেইরূপেই অনন্ত কালকবলে নিপতিত হয়। বর্ত্তমান হিন্দু-ললনা-পারিজাতদিগের বিকসিত হইয়া স্বীয় সৌরভে

জগতকে আমোদিত করিবার অবকাশ বড়ই বিরল। শৈশবে তাহারা পিতৃগৃহে প্রাণ ও মন খুলিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে না, কেন না বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার কন্যার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্রের চিন্তায় দিবারাত্র মলিন মুখ দেখিয়া বালিকাপ্রসূন স্বাভাবিক বিকাশের অবসর পায় না। তারপর বিবাহান্তে সম্পূর্ণ অপরিচিত শ্বশুরগৃহে আসিয়া অজ্ঞাত আত্মীয়গণের তীব্র সমালোচনায় সুকুমার কিশোরী-কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই শুকাইতে থাকে। এ দৃশ্য প্রায় প্রতিগৃহে প্রত্যহ দৃশ্যমান; অথচ আমরা ইহার প্রতিবিধানে উদাসীন। ফলে আমাদের সংসারের শান্তি চিরতরে অস্তমিত। অধিকন্তু সময় সময় অনেকগৃহে অকালে অস্বাভাবিক মৃত্যু আসিয়া পরিবারবর্গকে আকালিক বাত্যার ন্যায় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া রাখিয়া যায়। আমাদের পাপ গুরুতর, বিশ্ব-নিয়ন্তার শাস্তিও যে সময়ে অনুরূপ না হয় তাহা নহে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার ন্যায় আমাদের দেশে যদি প্রাত্যহিক জীবনী লেখার প্রথা থাকিত তাহা হইলে ঐসব ললনা-কুসুমদের ডায়িরী গ্রন্থ প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের অপেক্ষাও প্রাণস্পর্শী হইত।

আমরা বর্ত্তমানে যে পুণ্যবতীর জীবনী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভগবত্-প্রসাদে তাঁহার তাদৃশ কোনও রূপ নিত্য সঙ্কটময় জীবনী পরিচালনা করিতে না হইলেও, তিনি অবস্থাবৈচিত্র্যে যেরূপ বিবিধ ঘটনাপূর্ণ কর্ম্মময় জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের মতে আমাদের বঙ্গীয় ললনাদের বিশেষভাবে অনুকরণীয়। বাল্যে পিতামাতা ও ভ্রাতা-ভগিনীদের হৃদয়ের স্নেহলাভ, বিবাহান্তে পতি ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর একান্ত প্রীতিলাভ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পতিগৃহস্থিত সমগ্র পরিবার-বর্গের ও আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ও ভক্তি আকর্ষণ, ইহা খুব অল্প বঙ্গ-বধূর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বসন্তকুমারী আজীবন তাহার জীবন-প্রবাহ এমনই এক বিচিত্র অনন্যসাধারণ খাতে চালাইয়া গিয়াছেন যে তিনি

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই সমুদয় সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। অকালে তাঁহার পরলোকগমনে কেবল যে তাঁহার পতি ও ভ্রাতা-ভগিনীগণ প্রকৃত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার জনকগৃহের এবং শ্বশুরগৃহের আত্মীয় স্বজনগণ ব্যতিরেকে যাঁহারা কেবল স্বল্পকালের জন্য তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহার শোকে অনেকদিন পর্য্যন্ত মুহ্যমান ছিলেন। এই সুবিশাল পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া আজি পর্য্যন্ত অনন্ত জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়া আসিতেছে, কিন্তু যে জন্মে বা মৃত্যুতে দশ জন সমাসক্ত সেই জন্ম বা মৃত্যুই স্মরণীয়। আমরা যাঁহার জীবনী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত তাঁহার মৃত্যুতেও শত শত ব্যক্তি নিতান্ত কাতর; তাই অক্ষমতাসত্ত্বেও দু চারিটি কথা সেই পুণ্যবতী সম্বন্ধে বলিয়া আপনাকে ধন্য করিতে সাহসী হইতেছি।

বসন্তকুমারী যেমন কন্যারূপে পিতৃগৃহের অলঙ্কার ছিলেন ও বধূরূপে শ্বশুরগৃহের রত্ন ছিলেন, তদ্রূপ তিনি তাঁহার পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বালিকাদের শিক্ষাদাত্রী ও সমবয়স্কাদের উপদেষ্ট্রী ছিলেন। বাঙ্গালা লেখাপড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ উপাদেয় রন্ধন, বুনন, সীবন, সাজসজ্জা, কি যে তিনি না জানিতেন তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। দেবতা দ্বিজে যেমন তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল তেমনই তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মশীল থাকিতেন। অলসতা তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। নিজের পুত্র-কন্যা ছিল না বটে, কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও নিঃসন্তান দেখিতে পাইত না। দেবর ও জ্ঞাতিদের পুত্রকন্যাদের তিনিই প্রকৃত জননী ছিলেন। যে বালক বা বালিকা যতই দুষ্ট বা অনাবিষ্ট হউক না কেন, বসন্তকুমারীর নিকটে গেলে কি জানি কি মন্ত্রগুণে সকলেই সুশীল ও সুশান্ত হইয়া তাঁহার কথানুরূপ কার্য্য করিত। গ্রামস্থ কি বৃদ্ধাগণ, কি যুবতীগণ, কি বালিকাগণ সকলেই শত মুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। তাঁহার হৃদয় বড়ই নরম ছিল। তিনি কখনও পরের দুঃখ দেখিতে

পারিতেন না। নিতান্ত অপকারীও প্রকৃত কষ্টে পড়িয়াছে জানিতে পারিলেই তিনি যথাসাধ্য তাহার সাহায্য করিতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার পতিভক্তির তুলনা হয় না। তিনি যেরূপ অনন্তপরায়ণ প্রেম ও ভক্তিতে চিররুগ্ন পতিকে জীবিত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সমুদায় বঙ্গীয় ললনাদের আদর্শ। কে মনে করিতে পারিয়াছিল যে চিররুগ্ন, জীবন ও মৃত্যুর সুদীর্ঘ দ্বন্দ্ব মধ্যে বর্ত্তমান পতিদেবকে শিরোদেশে বর্ত্তমান রাখিয়া ভাগ্যবতী পুণ্যময়ী স্বর্গে চলিয়া যাইবেন ? ফলতঃ পত্নীর প্রেমেই যে পতির জীবন তাহা বসন্তকুমারীই স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুললনার আদর্শ জীবনযাপন করিয়া পুণ্যবতী পতিপদে শিরোরক্ষা করিয়া সতীলোকে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের আদর্শ আমাদের বঙ্গ কামিনীগণের নিকটে অক্ষয় অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার পরিচিতা ও অপর অপর নারীগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে আমাদের গৃহের অশান্তি বিদূরিত হইবে, নিতান্ত অভাব ও অভিযোগের মধ্যেও বাঙ্গালী হিন্দুগৃহ আবার সুখ-স্বচ্ছন্দতায় পূর্ণ হইবে; কেননা আমাদের গৃহের অশান্তি ও গোলযোগের কারণ শুদ্ধ অর্থাভাব নহে, গৃহে গৃহে প্রকৃত গৃহিণীর অভাবেই আমরা আজকাল নানারূপ কল্পিত অশান্তি ও অভাবে অস্থির হইয়া পড়িতেছি। পত্নী যে গৃহিণী, সচিব, সখী, উপদেষ্ট্রী ও গৃহলক্ষ্মী এসব কথা আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। তাই একের অভাবে প্রায় প্রতিগৃহ লক্ষ্মীসত্ত্বেও লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িতেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্য ও কৈশোর।

ঠনঠনিয়ার বসুবংশ কলিকাতার কায়স্থসমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে স্বীয় জন্মভূমি হুগলী জেলার অন্তর্গত পানসেওলা গ্রাম ছাড়িয়া মাণিকতলার অন্তঃপাতী বাঘমারীতে আসিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করেন। (১) তৎপরে কর্ম্মবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠনঠনিয়ায় উঠিয়া গিয়া বাস করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ ঠনঠনিয়ায় বাস করিয়া আসিতেছেন।

মদনমোহনের চারিপুত্র। জ্যেষ্ঠ খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমে সাতটি হউসের মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র দুর্গাচরণ ও শিবচন্দ্র, ইহাঁরাও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানা হউসে কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মদনমোহনের চতুর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠ পুত্র তারিণীচরণের নাম কলিকাতার বড়লোকদের মধ্যে সর্ব্বত্র সুবিদিত। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ধনপতিদের মধ্যে তারিণীচরণ একজন অগ্রগণ্য। বসন্তকুমারীর পিতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় মদনমোহনের দ্বিতীয় পুত্র দুর্গাচরণের পৌত্র ছিলেন। এই বসুবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সহজ মুখ্য কুলীন ছিলেন। কিন্তু পরে স্বপর্য্যায়ে ঘর না পাইয়া মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো কুলীনের কন্যা কুলে গ্রহণ করেন। তদবধি

(১) খ্যাতনামা সমাজ-সংস্কারক হাইকোর্টের জজ ৺শারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও পানসেওলা নিবাসী ছিলেন। উক্ত মদনমোহন বসুর জ্ঞাতিগণ এখনও পানসেওলায় বাস করিতেছেন।

উঁহারা গ্রহণের ঘরের কুলীনের আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ইঁহাদের আদান প্রদান এখনও মুখ্যের ঘরে হইতেছে। এরূপ নির্দ্দোষ 'মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো' কুলীন কলিকাতা অঞ্চলে নিতান্ত বিরল। ক্রমশঃ বসুবংশের বংশধর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহারা রায়বাগান, রায়পুকুর, শ্যামবাজার, বাঘমারী প্রভৃতি কলিকাতার নানা স্থানে উঠিয়া গিয়া বসতি করিতেছেন। এক কলিকাতায়ই এখন ইহারা প্রায় ত্রিশ ঘর বর্ত্তমান। কি ক্রিয়াকাণ্ড, কি অর্থমহিমা, সর্ব্ববিষয়ে এই বসুবংশ বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে অগ্রণীদের অন্যতমরূপে খ্যাত।

এই সুবিখ্যাত বসুবংশের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুই বসন্তকুমারীর পিতা। ২৪ পরগণার অন্তর্গত এড়েদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা কৃতার্থময়ী তাঁহার গর্ভধারিণী। ১২৮২ সালের ১৫ই ভাদ্র রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে ঠন্‌ঠনিয়ার অন্তঃপাতী ৫৭।১।১ নং কলেজষ্ট্রীটস্থ পিতৃভবনে বসন্তকুমারী ভূমিষ্ঠ হ'ন। বসন্তকুমারী তাঁহার জনক জননীর দ্বিতীয়া কন্যা।

পূর্ণচন্দ্রের সাত পুত্র ও ছয় কন্যা। পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। (১) পূর্ণচন্দ্র একজন স্বনামখ্যাত অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। 'পি, সি, বসু এণ্ড কোং' নামে তাঁহার একটী কাপড়ের ইন্‌ডেণ্টের যৌথ কারবার ছিল। বড়বাজার নিবাসী খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোয়েঙ্কা উঁহার একজন অংশীদার ছিলেন। (২) ইহা ছাড়া পূর্ণবাবুর সরিষা ও ক্যাষ্টর-অয়েলের দুইটি কল ছিল; তদ্ব্যতীত ভূসম্পত্তিও বেশ ছিল।

(১) বিপিনবিহারী, বিনোদবিহারী, রাসবিহারী, কুঞ্জবিহারী, নলিনবিহারী, পুলিনবিহারী ও অটলবিহারী, ইঁহারা পূর্ণবাবুর সাত পুত্র। সুরবালা, বসন্তকুমারী, হেমন্তকুমারী, গোলাপকুমারী, ধীরণকুমারী ও কিরণকুমারী, ইঁহারা পূর্ণবাবুর ছয় কন্যা।

(২) উক্ত গোয়েঙ্কা মহাশয়ের পুত্রই এখনকার বিখ্যাত ধনী স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা।

বসন্তকুমারী বড় ঘরের মেয়ে হইয়াও কখন গর্ব্বিতা ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণা জননীর নিকটে তিনি গৃহস্থালীর ও দেবার্চ্চনার সমুদায় কর্ম্ম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। পিতার অবস্থাসৌষ্ঠব-সত্ত্বেও জননী তাহাকে বিলাসিনী হইতে শিক্ষা দেন নাই। গৃহস্থালীর যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্বীয় জীবনযাপনে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাইয়া কন্যাদের শিক্ষা দিতেন। বাড়ীতে পাচক, ভৃত্য ও পরিচারিকা বর্ত্তমানেও বসন্তকুমারী মাতার নিকটে নানাবিধ রন্ধন, গৃহসজ্জা, দেবার্চ্চনার কার্য্য প্রভৃতি বেশ ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন।

কলিকাতায় কুমারীগণ সাধারণতঃ মিসনারী স্কুলে গিয়া গৃহলক্ষ্মীদের আচার ব্যবহার একেবারে শিখিবার অবকাশ পায় না, অধিকন্তু নানাবিধ বিলাসিতা শিক্ষা করিয়া বিবাহান্তে শ্বশুরগৃহে গিয়া বড়ই বিপদের মধ্যে পতিতা হয়। বসন্তকুমারীর জননীর সুবিবেচনায় তাঁহার কখনও মিসনারী স্কুলে যাইতে হয় নাই, সুতরাং বিবাহান্তে শ্বশুরগৃহে আসিয়া কোনরূপ বিপদেও পড়িতে হয় নাই। তাহা বলিয়া তিনি অশিক্ষিতা ছিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরীর প্রসাদে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিদ্য এবং সীবন বুনন প্রভৃতি শিল্পবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বসন্তকুমারীর ভ্রাতৃজায়া প্রমীলাসুন্দরী বাস্তবিকই রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী ছিলেন। তিনি যেমন শ্বশুরগৃহে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজিতা ছিলেন, তেমনি তাঁহার ছোট দেবর ও ননদ প্রভৃতিকে অপার্থিব স্নেহে বশ করিয়া নানাবিধ বিদ্যায় বিভূষিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্যই বসন্তকুমারী চিরদিন কলিকাতার অধিবাসিনী ও ধনবানের আদরিণী কন্যা হইয়াও সুদূর পল্লীগ্রামে শ্বশুরগৃহে যাইয়া কোনরূপ অসুবিধা বোধ করেন নাই, বরঞ্চ সেখানে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর ও ননদ প্রভৃতির স্নেহ ও আদর আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ গৃহশিক্ষাই রমণীর প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষার গুণে রমণী কালে গৃহিণীত্ব লাভ করেন। আমাদের দেশে এখন আর সে শিক্ষা নাই। গৃহিণী কন্যাকে ভালরূপ আহার এবং মূল্যবান্ পরিধেয় ও অলঙ্কারে বিভূষিতা এবং অর্থবান্ পাত্রে দান করিতে পারিলেই চরিতার্থ হন। কন্যা কিসে মানুষ হইবে, কিসে ভবিষ্যতে কন্যার গৃহ সুখ ও শান্তির আগার হইবে, তাহার উপযোগী শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনে শতকরা ৯৯ জন জনকজননীই উদাসীন। অধিকন্তু অবস্থার অধিক সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কন্যাকে পরিপালিত করিয়া ভবিষ্যতে ভর্ত্তৃগৃহ তাহার পক্ষে কণ্টকময় করিয়া রাখেন। সর্ব্বোপরি আমাদের দেশের সুলভ উপন্যাসগুলি অপরিপক্কমতি নববধূদিগের জীবনের সমুদায় সুখ ও শান্তি একেবারে হরণ করে। কন্যাগণ পিতৃগৃহে বাসকালে না শেখে গৃহকার্য্য, না শেখে মিতাচার, শেখে কেবল বস্ত্রালঙ্কারের বিলাস ও অবস্থাধিক বাক্যঘটা, সর্ব্বোপরি সুলভ উপন্যাসে বিবৃত কল্পিত সুখ ও ভোগ। বরের পিতামাতাও এখন আর পুত্রবধূতে ভাবী গৃহিণী খোঁজেন না। তাঁহারা খোঁজেন কেবল কন্যার পিতার বিপুল অর্থ, আড়ম্বরপূর্ণ পদমর্য্যাদা ও কন্যার ঝলঝল বাহ্যসৌন্দর্য্য। উপরন্তু কেহ কেহ কন্যার গুণ খুঁজিতে গিয়া কন্যার লিপি-লিখন-কুশলতা ও সঙ্গীতনিপুণতা পরীক্ষা করেন। কিন্তু গৃহিণী হইতে গেলে যে সব গুণের দরকার সেদিকে একটিবারও খবর নেন না। সুতরাং প্রায়ই প্রকৃত গুণবতী উপেক্ষিতা হইয়া বিলাসপ্রিয়া ধনি-নন্দিনী গৃহবধূরূপে গৃহীতা হ'ন।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সৃষ্টিবৈচিত্রের দিকে একটু প্রণিধান-পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে তাঁহার বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থ বিভিন্ন কার্য্যের উপযোগী বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। যেমন বালকের ও যুবকের কর্ম্মক্ষেত্র এক নহে, সেইরূপ পুরুষের ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র এক নহে।

এক্ষণে অজ্ঞতাবশতঃ আমরা যদি পুরুষ ও নারীকে এক ছাঁচে গঠিত করিতে চেষ্টিত হই, তাহা হইলে হয় পুরুষ নারী হইয়া যাইবে, না হয় নারী পুরুষ হইয়া যাইবে ; ফলে সংসারে কেবল বিশৃঙ্খলা আসিবে। বিশেষ দূরে না গিয়া কেবল আমাদের পারিবারিক সুশৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই তথায় পরিবারস্থ প্রতি ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম রহিয়াছে। একে অন্যের কার্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বিষম হট্টগোল উপস্থিত হয়। গৃহিণী যদি বাহিরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ও কর্ত্তা যদি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হ'ন, তাহা হইলে সে গৃহে সময়মত আহার্য্যই মিলে না।

স্বভাবতঃ নারীজাতি সমুদায় কমনীয় গুণের আধার, সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষা বিষয়ে আমাদের এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে তাঁহারা যাহাতে ঐ সব বিধিদত্ত কমনীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া বিধাতার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করিয়া সংসারকে সুখ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি আদর্শ গুণাবলীর পূর্ণক্ষেত্র করিয়া তুলিতে পারেন। কিসে কন্যা প্রকৃত গৃহিণী হইবে, কিসে কন্যা শ্বশুর-গৃহের গৃহলক্ষ্মী হইয়া সেই সংসারকে সুখ ও শান্তিময় করিয়া তুলিবে তাহার দিকে প্রতি পিতামাতার দৃষ্টি থাকা নিতান্ত দরকার। বাঙ্গালায় আবার আমরা সকলে একত্র হইয়া থাকি, গৃহবধূটিকেও পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া উঁহারই একজন হইয়া থাকিতে হইবে। ইহা যে কত শিক্ষাসাপেক্ষ তাহা আমাদের সর্ব্বদা বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ইহার অভাবে নিয়ত গৃহে গৃহে অশান্তি, অভাব ও যুদ্ধক্ষেত্র।

সৌভাগ্যক্রমে বসন্তকুমারী মাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সুশিক্ষায় প্রকৃত গৃহিণীর শিক্ষালাভ করিয়া শ্বশুরগৃহে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার শ্বশুরগৃহ সুখ ও শান্তির আগার ছিল। আমাদের বর্ত্তমান বালিকা-বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার অভাব বসন্তকুমারী তাহা জননী ও ভ্রাতৃজায়ার নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ আমাদের অধুনাতন বিদ্যালয়ের

শিক্ষায় সংযম ও ধর্ম্মানুরাগের বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়, অথচ এই দুইটি কি পুরুষ, কি নারী সকলেরই শ্রেষ্ঠগুণ। রমণীর সর্ব্বদা হাসিভরা মুখখানি, প্রাণখুলিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, কর্ত্তব্যসাধনে অনুরাগ, গৃহস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি স্নেহ ও মমতা, অধর্ম্মে ঘৃণা, ধর্ম্মপ্রাণতা, স্বীয় ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস, স্নেহ ও প্রীতির মধ্যে গৃহে ধর্ম্মভাব জাগরিত করা, গার্হস্থ্য-বিলাস বর্জ্জন, রন্ধনকুশলতা, সীবন, বুনন ও অন্যান্য গৃহস্থিত কারুকার্য্যে দক্ষতা, সন্তানপালনানুরাগ এই সব থাকিলে গৃহটি যেমন সুখের ও শান্তির নিকেতন হয়, সেরূপ কি উপন্যাস-পাঠনিরতা, বহুমূল্য-বেশভূষা-সজ্জিতা, গৃহকর্ম্মে উপেক্ষাকারিণী, ধর্ম্মচিন্তাবর্জ্জিতা, রন্ধনাদিঘৃণাকারিণী গৃহিণী-দ্বারা কখনও সম্ভবে? নারী লেখাপড়া শিখিবে ও উচ্চ বিদ্যালাভ করিবে, হৃদয়ের বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য, বিলাসের জন্য নহে।

বসন্তকুমারীর জনক ও জননী এবিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তাশীল ছিলেন বলিয়া নিজ গৃহে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূরূপে ললনারত্ন প্রমীলাকে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরকন্যাগুলিকে আদর্শ বঙ্গরমণী করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাই ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে বিবাহান্তে পতিগৃহে যাইয়া বসন্তকুমারী নিজেও সুখী হইয়াছিলেন এবং শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, ননদ এবং সর্ব্বোপরি পতিদেবকে অনুপম সুখে সুখী করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহিত জীবন।

১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বাদশ বর্ষে পড়িতে না পড়িতেই বসন্তকুমারীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পাঁচদিন পরেই নব বধূকে পতিসঙ্গে সুদূর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রায়েরকাঠী গ্রামে শ্বশুরগৃহে যাইতে হইয়াছিল। এস্থলে বসন্তকুমারীর শ্বশুরবংশের কিছু পরিচয় প্রদান নিতান্ত আবশ্যক, কেননা বঙ্গীয় হিন্দুরমণীর প্রকৃত পরিচয় তাঁহার পতিকুল।

বসন্তকুমারীর পূজনীয় শ্বশুর শ্রীযুক্ত মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন *। যে বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল উহা রায়েরকাঠীর রাজবংশ বলিয়া এখনও সর্ব্বত্র বিদিত। ইঁহাদের আদি নিবাস ২৪পরগণার অন্তঃপাতী দ্বিগঙ্গা (দীর্ঘাঙ্গ) গ্রামে। দিল্লীর বাদসাহ আকবরের ফারমাণ অনুসারে দীর্ঘাঙ্গের খ্যাতনামা মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত কিঙ্কর সেন সেলিমাবাদ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পরগণার প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। † তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে মঘদিগকে যুদ্ধে

* দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের প্রাচীন লোকদিগের নিকট মাধবনারায়ণের নাম সুপরিচিত। যাঁহারা তাঁহাকে না দেখিয়াছেন তাহারাও তাঁহার নাম জানেন। তীর্থাদিতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে ও অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজে মাধব নারায়ণের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। রায়েরকাঠীর রায়চৌধুরীগণ দক্ষিণরাঢ়ীয় সেনবংশজাত কায়স্থসমাজের মুখ্য মৌলিকাগ্রণী গোষ্ঠীপতি।

† কিঙ্কর সুবিখ্যাত দ্বাদশ ভুঁইয়ার অন্যতম। তিনি কিঙ্করভুঁইয়া নামেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিলেন।

পরাজিত করিয়া সুগন্ধানদীর তীরবর্ত্তী রায়েরকাঠী, রাজাপুর, ছত্রজিতপুর প্রভৃতি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করেন। কিঙ্করের বংশধরগণ বাদসাহ সরকার হইতে ক্রমে 'রায়রাইয়া', 'রায়চৌধুরী', ও 'রাজা' খেতাব পাইয়াছিলেন। 'রায়-চৌধুরী'দিগের নির্ম্মিত গ্রাম বলিয়া, উহার নাম রায়েরকাঠী হইয়াছে। মাধবনারায়ণ কিঙ্কর হইতে জ্যেষ্ঠক্রমে দ্বাদশ পর্য্যায়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বসন্তকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। রায়েরকাঠী গ্রামটি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রেণীর সর্ব্ববিধ সামাজিকবর্গ পূর্ণ। এই গ্রামের মধ্যে সহজ মুখ্য কুলীন হইতে মধ্যাংশ দ্বিতীয়ের পো পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ কুলীনের ও সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণের অবস্থিতি আছে। গ্রাম-খানি স্বপ্নলব্ধা ভগবতী সিদ্ধেশ্বরী রক্ষিত। ফলতঃ রায়েরকাঠীর গোষ্ঠীপতি মৌলিক জমিদারদের নাম সর্ব্বত্র কায়স্থসমাজে সুপরিচিত। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে এমন কেহ নাই, যাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের একজন না একজন রায়েরকাঠী গিয়া বাস না করিয়াছিলেন, কিংবা রায়েরকাঠীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহেন; কেন না তখন বঙ্গজপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ সৃষ্টির জন্য রায়ের-কাঠীর রাজারা বিভিন্ন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে প্রভূত অর্থও ভূমি মহাত্রাণ করিয়া দিয়া তথায় লইয়া গিয়া চিরদিনের তরে বাস করাইতেন। (১)

বসন্তকুমারীর শ্বশুর শ্রীযুক্ত মাধবনারায়ণ যেমন একজন অসাধারণ রূপবান্ পুরুষ ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার গুণগ্রামেরও ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহাকে দেশশুদ্ধ সকলে 'সেজরাজা' বলিয়া ডাকিত। তিনি বাঙ্গালা, পারসীক ও হিন্দী ভাষায় এতদূর সুদক্ষ ছিলেন যে সমুদয় দিন ভরিয়া

(১) এমন কি সুদূর যশোহর, খুলনা, কৃষ্ণনগরও কলিকাতার অধিবাসী বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এখনও রায়চৌধুরীদিগের প্রদত্ত মহাত্রাণ ও জায়গীর ভোগ করিতেছেন।

অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সংস্কৃতশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। নানা দেশস্থ পণ্ডিতদিগের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চ্চায় তিনি সর্ব্বদা অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার আকৃতির অনুরূপ তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল। যাহার কর্ণবিবরে তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর একবার প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার পক্ষে উহা আর ভুলিবার যো ছিল না। রায়েরকাঠীর বর্ত্তমান রাস্তাঘাট প্রভৃতি সমুদায়েরই কর্ত্তা মাধবনারায়ণ। তাঁহাকে পরগণা শুদ্ধ লোক এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত যে তাহার বিচার ত্যাগ করিয়া বড় কেহ আদালতে বিচারার্থী হইত না। এমন কি, তাঁহার প্রজা হউক আর নাই হউক, যাহার বাড়ীতে যে ফলটি প্রথম হইত 'সেজরাজাকে' অগ্রে প্রদান না করিয়া সে উহা গ্রহণ করিত না। তাঁহারই প্রযত্নে রায়েরকাঠীতে প্রথমে এণ্ট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়া তিনি উহার সম্পাদক হ'ন। ২৪পরগণার অন্তর্গত পানিহাটী-নিবাসী মুখ্যকুলীন শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা জগত্‌মোহিনী মাধবনারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী। এক পুত্র রাখিয়া প্রথমা-পত্নীর কালপ্রাপ্তির পর মাধবনারায়ণ জগত্‌মোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। জগত্‌মোহিনীর চারি পুত্র ও এক কন্যা। (১) প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীই বসন্তকুমারীর স্বামী।

মাতামহ নগেন্দ্রনারায়ণকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে এই বিবাহ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। মাধবনারায়ণ তখন স্বগ্রামে মধুমেহ পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। ডাক্তার ও বৈদ্যগণ পীড়া অনারোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। সেই নিমিত্তই রাজা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার জীবদ্দশায়ই নগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ দেন। এই বিবাহে তিনি

---

(১) জগত্‌মোহিনীর নগেন্দ্রনারায়ণ, যতীন্দ্রনারায়ণ, জীবেন্দ্রনারায়ণ ও হরেন্দ্রনারায়ণ নামে চারি পুত্র ও মানদাসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা হয়।

নিজে কলিকাতায় যাইতে পারেন নাই। সমুদায় কার্য্যভার তাঁহার শ্বশুর-মহাশয়ের উপরই অর্পিত হয়। রায়েরকাঠী হইতে রাজা তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী, দেওয়ান শ্রীকাশীশ্বর রায় এবং পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য মহিমাচন্দ্র চন্দ্র ও পরিচারিকা মুক্তকেশী দাসীকে (১) পাঠাইয়া দেন। নগেন্দ্রনারায়ণের মাসীমাতা ঠনঠনে নিবাসিনী শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনীর প্রযত্নে ও তত্ত্বাবধানেই এই বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় (২)। বিবাহের পাঁচ দিন পরেই পূর্ব্বোক্তা হেমাঙ্গিনী নববধূকে লইয়া রায়েরকাঠীতে গমন করেন। মাধবনারায়ণ নব পুত্রবধূকে তাঁহার নিজের তালুক জোলাগাতী নামক গ্রাম হইতে বার্ষিক ১০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি ও একখানি মোহর যৌতুকস্বরূপ দিয়াছিলেন। জগৎমোহিনী এক যোড়া রতনচূড় দিয়া পুত্রবধূর মুখ দর্শন করেন।

বিবাহের যাত্রায়ই বসন্তকুমারী ভক্তি ও শুশ্রূষায় শ্বশুর ও শ্বশ্রূর হৃদয় আকর্ষণে সমর্থ হইলেন, এমনকি তাঁহারা দুজনেই দু' এক দিনের মধ্যে তাঁহার নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। রায়েরকাঠীতে কিছুদিন থাকিয়া শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী নববধূ লইয়া পুনরায় কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বসন্তকুমারীর অদৃষ্টে আর শ্বশুরের শ্রীচরণ দর্শন ও সেবা ঘটে নাই। ১২৯৩ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখ মাধবনারায়ণের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। বসন্তকুমারী তখন কলিকাতায় পিত্রালয়ে ছিলেন। ইন্দ্রতুল্য শ্বশুরের হঠাৎ পরলোকপ্রাপ্তিতে তিনি শোকে নিতান্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। পিতা মাতার সান্ত্বনায় তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া

(১) এই মহিমাচন্দ্র চন্দ্র ও মুক্তকেশী নগেন্দ্রনারায়ণকে শৈশব হইতে প্রতিপালন করিয়াছিল।

(২) শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী গভর্ণমেণ্টের তোষাখানার দেওয়ান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাসের ভ্রাতৃবধূ।

শ্বশুরের পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু আজীবন তিনি খেদ করিতেন যে তিনি নিতান্ত অভাগ্যবতী, কেননা দেশপূজ্য দেবোপম শ্বশুরের তিনি সেবা-শুশ্রূষারও অধিকার পাইলেন না। বসন্তকুমারী চিরদিনই শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও স্বামীর গর্ব্ব করিতেন।

বসন্তকুমারীর পতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণও কৈশোর ও যৌবনে পিতার ন্যায় সুশ্রী ছিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ নানারোগের অজস্র যন্ত্রণায় তাঁহার চেহারা মলিন হইয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রনারায়ণ ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট না হইলেও বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মিতা, পরোপকার-চিকীর্ষা ও কার্য্যতৎপরতায় সর্ব্বত্র সুবিদিত। গ্রামস্থ সমাজে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। গ্রামের যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হয়, পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি যাহাতে সুপ্রতিষ্টিত থাকে, লোকেরা যাহাতে আচারভ্রষ্ট না হয়, পুণ্যতীর্থক্ষেত্রে যাহাতে বংশের কীর্ত্তিকলাপ বজায় থাকে, গ্রামস্থ নিরাশ্রয় বিধবাগণের যাহাতে দুটি অন্নের সংস্থান হয়, নগেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বদা এই সব কার্য্যের অনুরাগী। সংক্ষেপে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে কেহ কখনও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া একেবারে বিমুখ হন নাই। সুতরাং পতি ও পত্নীর মিলন যে রত্নকাঞ্চন সমাবেশ হইয়াছিল তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। বস্তুতঃ গৃহস্থালীতে দাম্পত্যকলহ সর্ব্বত্র প্রায় অনিবার্য্য, কিন্তু নগেন্দ্র-নারায়ণ ও বসন্তকুমারীর মধ্যে দাম্পত্য জীবনে কখনও একদিনের তরেও কোনরূপ মানোমালিন্য ঘটে নাই। উভয়ে উভয়কে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রেমে রূপজ মোহ আদৌ ছিল না, কেননা নগেন্দ্রনারায়ণ দিব্যকান্ত ও বসন্তকুমারী আদৌ গৌরবর্ণ ছিলেন না। তাঁহারাই সত্য পাণিগ্রহণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুই জীবন এক করিয়া লইয়াছিলেন, তাই আজীবন কখনও কোনও দ্বৈধ বা কলহ হয় নাই। নগেন্দ্রনারায়ণ পত্নীর নিকট গোপন রাখিয়া কখনও কোন কার্য্য করেন নাই, বসন্তকুমারীও আজীবন স্বামীর আদেশ ব্যতীত

কোনও কর্ম্ম করেন নাই। এক কথায় উহাঁরা দুইদেহে এক হৃদয় ছিলেন।

আজকাল স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া এক নূতন রব উঠিয়াছে। পুরুষগণ নারীজাতিকে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করায় নারীজাতি পশুরও অধম হইয়া রহিয়াছে, ইহাই স্ত্রীস্বাধীনতাবাদীদিগের উক্তি। কিন্তু তাঁহারা একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের উক্তির কোনও ভিত্তি নাই। প্রাগৈতিহাসিক কালে পৃথিবীর কোনও দেশে যখন বিবাহ সংস্কার কোনও সমাজে বর্ত্তমান ছিল না, যখন মানব-জাতি পশুরও অধম ছিল, তখন আমাদের দেশে উদ্দালক ঋষির পুত্র মহর্ষি শ্বেতকেতু ও চীনদেশে সম্রাট ফউহিই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য বিবাহ সংস্কার প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। মহাভারত পাঠ করিলে বিবাহ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে নারীজাতির স্থান সমাজে কিরূপ জঘন্য ছিল তাহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়। বস্তুতঃ মানব-সভ্যতার প্রধান চিহ্নই সামাজিক বিবাহ সংস্কার। উহা লিয়া দিয়া হৃদয়প্রধান নারীজাতি যদি যথেচ্ছচারিণী হ'ন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতি কি অবনতি হইবে তাহা সুধীজন মাত্রেই মনে করিতে পারেন। তবে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে আমরা যেরূপ স্ত্রীজাতির মনুষ্যত্ব সম্পাদনে উদাসীন তাহা আদৌ প্রশস্ত নহে। সমাজের উন্নতির জন্য যেমন পুরুষের শিক্ষার দরকার সেইরূপ নারীজাতিরও জ্ঞানপ্রসারের নিতান্ত আবশ্যকতা। একবিধ শিক্ষা পুরুষ ও নারীর অবশ্য কখনও হইবার নহে। বিধিপ্রদত্ত অঙ্গাদিগঠনে প্রভেদ একেবারে বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন? আমাদের স্ত্রী-শিক্ষায় ঔদাসীন্য নিশ্চয়ই আছে, উহার জন্য আমরা নিন্দার্হ বটে। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা এদেশে নাই কে বলিবে? অবশ্য ভদ্রসমাজে মহিলাগণ একাকিনী যথেচ্ছ যাতায়াত করেন না। কিন্তু ভদ্রেতর সমাজে নারী-গণের অবাধগতি সর্ব্বত্র সমভাবে পরিদৃশ্যমান। কেবল যথেচ্ছ গমনা-

গমনই কি মনুষ্যত্বের অনুপমাপক ? হৃদয়ের সুপ্রসার, কুসংস্কারবর্জ্জন, সদসৎ-বিবেচনা, ধর্ম্মানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি মানবোচিত গুণগ্রাম ব্যতিরেকে কেবল যথেচ্ছাচারই কি স্ত্রীস্বাধীনতার লক্ষণ ? সমাজে আবার সেই পশুপক্ষীর মত স্ত্রীস্বাধীনতা কি কখনও অকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পতিসঙ্গে

পিতৃবিয়োগে নগেন্দ্রনারায়ণ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। একদিকে জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ক্ষমতাবান্, অপরদিকে ভ্রাতাগণ নাবালক, সর্ব্বোপরি জমীদারী-সংক্রান্ত নিজের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। যাহা হউক নগেন্দ্রনারায়ণ নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রায় দুইবৎসর কাল বিষয়-কার্য্য দেখিয়া পিতৃপ্রাপ্ত জমীদারীর শাসন ও সংরক্ষণের অনেকটা সুবিধা করিয়া ১২৯৫ সালে বসন্তকুমারীকে রায়েরকাঠীতে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। এই দুই বৎসর পতি ও পত্নীর মধ্যে পত্র-ব্যবহার ব্যতীত পরস্পরের সাক্ষাৎকারের আদৌ সুযোগ হয় নাই। পতির বিপদে পতিপ্রাণা অবশ্য এই দুই বৎসর নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ১৩।১৪ বৎসরের কিশোরী স্বামীর বিষয়সংক্রান্ত বিপদের কি আর প্রতিকার চিন্তা করিতে পারেন ? তথাপি তিনি প্রতিপত্রে প্রকৃত কার্য্য-সচিবের ন্যায় স্বামীকে উৎসাহিত ও সৎপথে চালিত করিতে যত্নবতী ছিলেন। তিনি বিবাহের পর আজীবন শ্বশুরগৃহকেই নিজের বাটী বলিয়া জানিতেন এবং স্বামী ও স্ত্রী যে উভয়ে মিলিয়া একপূর্ণ আত্মা গঠিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্যই

কলিকাতার দৈনিক জীবনস্রোত হইতে পাড়াগায়ের জীবনী সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও, উহা তাঁহার অশ্রদ্ধেয়, কিংবা অপ্রিয় ছিল না। তিনি বরং কলিকাতা অপেক্ষা রায়েরকাঠীতে স্বামীর নিকটে থাকিতে অধিকতর ভালবাসিতেন। শ্বশুর ও স্বামীর ভিটা আজীবন তাঁহার নিকটে পুণ্যক্ষেত্র ছিল।

নগেন্দ্রনারায়ণ পিতৃবিয়োগের প্রায় দুই বৎসর পরে একটু সুস্থ হইয়া পত্নীকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া এক নূতন রকমের বিপদে পড়িলেন। তাঁহার বৃদ্ধ মাতামহ বলিলেন যে তিনি যে কয়েকটা দিন জীবিত আছেন আর তাহাকে ছাড়িবেন না, নাতি বউ লইয়া নগেন্দ্রনারায়ণের দাদামহাশয়ের বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। নাতি ও নাতিবউএর স্নেহ, ভক্তি ও সেবায় তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিন-কয়েকটা কাটাইতে চাহেন। নগেন্দ্রনারায়ণ দাদামহাশয়ের স্নেহের অগাধতা জানিতেন, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন অন্যায় বুঝিলেন। কিন্তু বাড়ীতে জননী নিতান্ত শোকসন্তপ্তা, তাঁহার নিকটে পত্নীকে লইয়া যাওয়া বড়ই আবশ্যক এবং নিজে উপস্থিত না থাকিতে পারিলে বিষয়সংক্রান্ত নানারূপ গোলযোগের ও সম্ভাবনা। তিনি বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। এদিকে পূর্ণচন্দ্রও কন্যা সুদূর রায়েরকাঠীতে যাইয়া বাস করে তাহা পছন্দ করিলেন না। তিনিও নগেন্দ্রনারায়ণকে সস্ত্রীক কলিকাতায় থাকিয়া বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের সেবা করিতে অনুরোধ করিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণের নানারূপ আপত্তির কথা শুনিয়া ইহাঁরা উভয়ে বলিলেন—'সম্পত্তির ভার ভ্রাতাদিগের উপর প্রদান করিয়া তুমি এখানে কোনও আফিসে চাকরি কর কিংবা কারবার কর। যাহাতে একটা ভাল চাকরি কি কারবার হয় তাহার ব্যবস্থা আমরাই করিব।' পূর্ণচন্দ্র অধিকন্তু বলিলেন—'দেখ নগেন্! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার আফিসের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণ দিতেছি'। নগেন্দ্রনারায়ণ পূজনীয়দের কথার

কোনও উত্তর তখন দিতে পারিলেন না। তিনি উভয়ের মনস্তুষ্টির জন্য আপাততঃ পত্নীকে মাতামহের আলয়ে আনয়ন করিয়া তাঁহার নিকটে বাস করিতে লাগিলেন।

বসন্তকুমারীর আন্তরিক ভক্তি ও সেবায় অল্পদিনের মধ্যে বৃদ্ধ কালীকৃষ্ণ দৌহিত্রবধূগতপ্রাণ হইলেন। বাটীস্থ অন্যান্য সকলেও বসন্তকুমারীর সদ্ব্যবহারে তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইলেন। এইরূপে তিনমাস অতীত হইয়া গেল। পরিশেষে একদিন নগেন্দ্রনারায়ণ দাদামহাশয়ের নিকটে স্বীয় জননীর মানসিক অবস্থা ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে নাবালক ভ্রাতাদের সরিকানদের সঙ্গে জমিদারী বুঝিয়া শাসন সংরক্ষণ করিবার অসম্ভবতার কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। কালীকৃষ্ণ প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে নগেন্দ্রনারায়ণের মুখে নিজের কন্যার অবস্থা ও বিষয়সম্পত্তির ক্ষতির কথা বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার রায়েরকাঠীতে গমনে আর অমত করিলেন না। তিনি বলিলেন—'নগেন, তবে তুমি বাড়ী যাও, জগৎকে আমার কথা বলিয়া সুস্থ হইতে বলিবে। মা আমার তোমাদের মত পুত্ররত্নদের পাইয়া পরম ভাগ্যবতী। এখন যাহাতে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহাই তাহার কর্ত্তব্য। স্বর্গে বসিয়া জামাতা তাহাতে সুখী হইবেন। মাকে সুস্থ করিয়া ও বিষয়পত্রের সুব্যবস্থা করিয়া আবার তুমি সত্বর আসিবে। আমি নাতি বধূকে ছাড়িয়া দিব না। দিদি আমার পূর্ব্ব জন্মের কে ছিল জানি না।'

মাতামহের অনুরোধ উপেক্ষা করা নগেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে অসাধ্য। তিনি একাকী সে যাত্রা বাটীতে আসিলেন। তখন বসন্তকুমারী কখন পিত্রালয়ে কখনও দাদামহাশয়ের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা পতিশোকসন্তপ্তা শ্বশ্রূমাতার জন্য কাঁদিত। তাই ১২৯৫ সালের শেষভাগে নরেন্দ্রনারায়ণ আবার কলিকাতায় আসিয়া

মাতামহ ও শ্বশুরমহাশয়দের অনেক অনুনয় করিয়া বুঝাইয়া বসন্ত-কুমারীকে রায়েরকাঠীতে লইয়া গেলেন।

মাধবনারায়ণের জীবদ্দশায় তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীযুক্তা মানদা-সুন্দরী তাঁহার পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়েই থাকিতেন। তাঁহার পতি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রায়েরকাঠী হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধানে পিরোজপুর মহকুমায় ওকালতি করিতেন। প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন তিনি রায়েরকাঠীতে আসিয়া বাস করিতেন। মাধবনারায়ণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনারায়ণ সপরিবারে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত পৃথক্-অন্ন হইয়া গেলেন। কন্যা মানদাসুন্দরীকেও ইহার কিছুকাল পরেই পিরোজপুরে স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে হইল; তবে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া শোকসন্তপ্তা জননীর তত্ত্বাবধারণ করিয়া যাইতেন। নগেন্দ্রনারায়ণের অন্য কোন ভ্রাতারও তখন বিবাহ হয় নাই। সুতরাং দেশপূজ্য পতিশোকবিধুরা শ্বশ্রূমাতার সেবা ও শুশ্রূষার জন্য বসন্তকুমারীর উপস্থিতি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ গৃহকর্ত্রী শোক-সমাচ্ছন্ন থাকায় ও গৃহ-কলহে সংসারে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বসন্তকুমারী যখন প্রকৃত শ্বশুরঘর করিতে আসিলেন তাহাকে এইরূপ নানাবিধ বিষম বিভ্রাটের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন মাত্র পঞ্চদশ বৎসর। কিন্তু জননী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার শিক্ষাগুণে তিনি কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান থাকিলেও বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় প্রৌঢ়ার তুল্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই সমুদায় অবস্থা বুঝিয়া লইলেন ও প্রাজ্ঞ গৃহিণীর ন্যায় স্বীয় কর্ত্তব্যক্ষেত্রে ঢুকিলেন। বস্তুতঃ বয়োবৃদ্ধত্ব কিছুই নহে, জ্ঞানবৃদ্ধত্বই সংসারে মানুষের প্রকৃত চালক। বসন্তকুমারী অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার প্রাণঢালা স্নেহ ও ভক্তিতে শ্বশ্রূ-মাতাকে শয্যা হইতে তুলিলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও সরল ভালবাসায়

দেবর প্রভৃতি গৃহস্থ পরিবারবর্গের হৃদয় আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। এইরূপে দুই একমাস যাইতে না যাইতেই সংসারে আবার পূর্ব্বের সুশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। শোকের দারুণ হাহাকার ও বিশৃঙ্খলার ভীষণ কলরব চলিয়া গিয়া শান্তির বিমল সুধাধারায় গৃহ প্লাবিত হইল, গৃহলক্ষ্মী গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ স্বস্তিলাভ করিলেন।

বসন্তকুমারীর শ্বশুরঘর করিতে আসা অবধি শ্বশ্রূ জগৎমোহনীর আর কিছু সাংসারিক কার্য্যকর্ম্ম দেখিতে হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, পূজা ও আহ্নিক ইত্যাদি আধ্যাত্মিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া হৃদয়ের দারুণ অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত রাখিতেন। বধূমাতা সংসারের সমুদায় কার্য্য দেখিবার মধ্যেও শ্বশ্রূমাতার সকল কার্য্যের আয়োজন করিয়া দিতেন। এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি একটু ক্লান্তি বা খেদ অনুভব করিতেন না, কিন্তু নিজ কার্য্যে সফলতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখখানি বিমল আনন্দে অপূর্ব্ব দিব্য শ্রীধারণ করিত। বসন্তকুমারীর আগমনে যেমন শ্বশুরগৃহে শান্তি প্রত্যানীত হইল, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে একে একে দেবরদিগের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। নবাগতা দেবর পত্নীদিগকে তিনি নিজের সহোদরাদের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি কখনও তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী বলিয়া মনে করিতেন না। পিতৃগৃহে যেমন ভ্রাতা ও ভগিনী মিলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতেন এখানেও সেইরূপ দেবর ও দেবরপত্নীদের সঙ্গে তাদৃশ থাকিতে চেষ্টা করিতেন। দেবরপত্নীরাও তাহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরার ন্যায় স্নেহ ও ভক্তি করিতেন। শ্বশ্রূমাতা পুত্রবধূদের মধ্যে তাদৃশ সহোদরার প্রীতি দর্শন করিয়া প্রাণের ভিতর বড়ই আনন্দ পাইতেন।

১২৯৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বসন্তকুমারীর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃপ্রাণা বসন্তকুমারী বড়ই শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। তিন বৎসরের মধ্যে দেশপূজ্য শ্বশুর ও পিতৃদেবের পরলোক প্রাপ্তিতে তিনি যেমন শোকাকুল

হইলেন তেমনি আপনাদের অভিভাবকহীন মনে করিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব শিক্ষার গুণে সংযমে শোক-বেগ ও বিবেকে নিরাশ্রয়তা দূর করিয়া চতুর্থ দিবসে বৃষোৎসর্গ ও যোড়শ ইত্যাদি দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন ও শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণ-ভোজন ও আত্মীয় ভোজন করাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পতিসেবা।

পতি ও পত্নীর অভেদ সম্বন্ধ ও একআত্মার কথা কেবল শাস্ত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ইদানীং দৈনন্দিন জীবনে একাত্মতা বা একহৃদয়তার কথা বড় কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখের সময়ে পত্নী পতি-সোহাগিনী, কিন্তু দুঃখ ও দৈন্যের সময়ে প্রায়ই পত্নী কলহপরায়ণা। দৈন্য ও বিপদে পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে বড় দেখা যায় না। তা ছাড়া সামান্য মনের অনৈক্যে কিংবা বিমতাচরণে উভয়ের মধ্যে অনেক সময়েই প্রচণ্ড ঝটিকা বহিয়া থাকে। কি বড়ঘরে কি ছোটঘরে প্রায় সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য প্রত্যহ প্রকটিত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম ধর্ম্মগ্রন্থে যাহাই থাক্‌, বিবাহমন্ত্র যতই পবিত্র হ'ক্‌, দাম্পত্যসম্বন্ধ যতই প্রগাঢ় ও অচ্ছেদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হ'ক্‌, সংসারে আজকাল আদর্শ দম্পতী প্রায় দৃষ্ট হইবে না। ইহার কারণ কি? কেন সেই পবিত্র সম্বন্ধ, সেই অচ্ছেদ্য বন্ধন, এইরূপ দারুণ অসুখ ও অশান্তিতে পরিণত হয়? ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দোষ উভয়তঃ অর্থাৎ কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ উভয়ের দোষেই এইরূপ ঘটিতেছে। বাজারে জিনিশ কিনিতে গিয়া নকল জিনিশ

কিনিলেন কি আসল কিনিলেন তাহা দেখিতে হইবে। বহ্বাড়ম্বর-ময় বরের বাজারেও কেবল বড়ঘরের পাশকরা ছেলে দেখিয়া অধিক দামে ক্রয় করিয়া আনিলেই সুপাত্র হইবে না। দাম্পত্যসম্বন্ধে আহার বিহার প্রধান প্রয়োজনীয় নহে, পরস্পর হৃদয়ের সম্মিলনই হইল প্রধান আবশ্যক। কয়জন পিতা কন্যার মনের মত বরের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? যাঁহারা টাকা খরচ করিতে পারেন তাঁহারা বরের পিতার অবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ, অধিকন্তু রূপ দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন, পূর্ব্বে বংশমর্য্যাদা দেখিতেন এখন আর তাহা দেখেন না। কিন্তু যাঁহার কাছে প্রাণাধিকা তনুজাকে সমর্পণ করিতেছেন, তাহার হৃদয়খানি কতদূর প্রশস্ত, তাহাতে মনুষ্যত্ব আছে কিনা, কন্যার সঙ্গে পাত্রের মনের ঐক্য হইবে কিনা, উভয়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একাভিমত কিনা, এসব একবারও ভাবিয়া থাকেন কি? এদিকে কন্যার যে পরের ঘর করিতে হইবে তদনুরূপ শিক্ষাদান কয়জন জনকজননী দিয়া থাকেন? পিতামাতা কন্যাকে বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু আহার ও পেয় সেবন করাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যার কিছু অধিগত করাইয়া, বাদ্য, সঙ্গীত প্রভৃতির কিছু শিখাইয়া গুণবতী করিয়া দিতে পারিলেই কন্যার প্রতি তাঁহাদের সব করা হইল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমাজের প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কন্যা কিছুই জানিতে পারিল না। সে না শিখিল কি করিয়া দশজনকে আপনার করিয়া লইতে হয়, না শিখিল সংযম, না শিখিল গৃহকর্ম্ম, এমত অবস্থায় সে কি করিয়া পরের ঘরে গৃহিণী হইবে? বিশেষতঃ পিতৃগৃহে অবস্থার অধিক সুখ স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হওয়ায় কন্যার শ্বশুরগৃহের অপেক্ষাকৃত অসাচ্ছন্দ্য নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। এদিকে বরের পিতাও আর গৃহলক্ষ্মীর অনুসন্ধান করেন না। তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, সুতরাং বধূর পিতার নিকট হইতে অবশ্য চক্রবৃদ্ধি মত সমুদায় খরচ প্রথমে আদায় করিবেন।

তারপর কন্যার রূপ ও তাহার পিতার পদমর্য্যাদা দেখিবেন, কেননা কন্যার পিতাই জামাতার ভাবিসংস্থান করিয়া দিবার জন্য দায়ী। তারপর দেখিবেন কন্যার গুণপণা, অর্থাৎ শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারে কিনা, ইংরাজি লিখিতে ও পড়িতে পারে কিনা, সঙ্গীতনৈপুণ্য আছে কিনা, নভেল নাটক পড়িতে জানে কিনা, কেহ কেহ ইহার উপরে কন্যা পলান্ন কোপ্তা, ফ্রাই, চপ প্রভৃতি করিতে জানে কিনা তাহারও খবর লইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে তাঁহার বাড়ীতে ললিতা বা বিলাসবতীকে লইতেছেন না, প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীকে লইতেছেন, যাঁহার আগমনের উপর গৃহের সমুদায় ভাবী সুখ ও শান্তি নির্ভর করিতেছে, তাহা একেবারে ভুলিয়া যান। ফলে গৃহে গৃহে অশান্তি, গৃহে গৃহে রণক্ষেত্র। সর্ব্বোপরি কি পুত্রের পিতা কি কন্যার জনক কেহই তাঁহাদের সন্তানদের গৃহী হইবার উপযুক্ততা সম্বন্ধে একবারও উপদেশ করেন না। মিল্‌টন্, সেক্ষপীর, কালিদাস প্রভৃতির কাব্যাদি পাঠে বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা সম্পাদিত হয় বটে, কিন্তু সংসারনির্ব্বাহের প্রবল সমরের উপযোগিতা সংক্রান্ত কোনও অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। পুত্র শিখেন অর্থোপার্জ্জন, পত্নী শিখেন অবারিত খরচ। সুতরাং সংসারে যে কিছু কিছু সঞ্চয়ও দরকার, অথচ প্রতি ব্যক্তিরই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, স্বগ্রামবাসী ও স্বদেশস্থ ব্যক্তিদের প্রতিও যে কতগুলি কর্ত্তব্য আছে, ইহা ইঁহারা শেখেনও না, কর্ত্তব্য বলিয়াও মনেও করেন না। পূর্ব্বকালে লোকে মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা আয় করিতে পারিলেই এ সব কার্য্যে উদ্যোগী হইতেন, এক্ষণে কিন্তু ১০০০ টাকা মাসে আয় হইলেও, গৃহস্থ এ সব কার্য্যে উদাসীন। কেন? উহার উত্তরের জন্য বহুদূর যাইতে হইবে না। জিনিশ-পত্র নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইলেও, গৃহিণীর ব্যয়সঙ্কোচের অভাবে প্রতি গৃহস্থই, যতই তাহার আয় বাড়ুক না কেন, অভাবের হস্ত হইতে রক্ষা পান না। তারপর এই সব কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে দম্পতীর

কাহারও লক্ষ্য নাই। কেহ কেহ আবার এ সব কর্ত্তব্যকে অযথা ব্যয় মনে করেন। আমাদের দৈনন্দিন লক্ষীছাড়া হইয়া যাইবার ইহাই একটি প্রকৃষ্ট কারণ। আমরা যতই কেন মুখে মুখে স্বদেশী হইতে চেষ্টিত হই না কেন, আমাদের মন ও প্রাণ বিলাতী দোষ-গুলিতে এমন ভাবে বিজড়িত যে উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ সুদুষ্কর। আমাদের মনের প্রশস্ততা নাই, অথচ আমরা মন খুলিয়া সাকার দেবতাকে নমস্কার করিতে পারি না। আমাদের চিত্ত অশিক্ষা-পঙ্কিল, অথচ আমরা শাস্ত্রের কথা মানিয়া লইতে পারি না। আমরা প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী, অথচ আমরা আত্মীয় স্বজনকে আপনার গৃহের কুটুম্ব বলিয়া মনে করিতে বা গৃহে স্থান দিতে অক্ষম। হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতায় কেহ কাহাকে তিলমাত্র বিশ্বাস করিতে পারি না, অথচ আমরা হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই বলিয়া চীৎকার করিতেছি। এই অন্তরের ও বাহিরের বৈষম্য বিদুরিত না হইলে আমাদের মঙ্গল নাই। এই বঙ্গীয় সামাজিক মহামরুতে যে দুই একটি পান্থ-পাদপের ন্যায় আদর্শ পরিবার এখনও বিদ্যমান আছেন, তাহাদের জন্যই বাঙ্গালার এখনও স্পন্দন আছে। তা না হইলে আমাদের মত কুসন্তানের ভারে বঙ্গমাতা মৃতকল্পা।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে মনস্বিনী নারীর কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনিও আমাদের এই ভীষণ মরুপ্রান্তরে একটী পান্থ-পাদপস্বরূপ ছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের সুশিক্ষায় তাঁহার নারী-বৃত্তিগুলি সুপরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া এবং তাঁহার পিতার পাত্র নির্ব্বাচনে মানুষের অনুসন্ধান ছিল বলিয়াই তিনি পতিগৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া-ছিলেন। বস্তুতঃ নগেন্দ্রনারায়ণ ও বসন্তকুমারীর দাম্পত্যজীবনের তুলনা নিতান্ত বিরল।

১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে নগেন্দ্রনারায়ণ যখন তাঁহার

বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বৈষয়িক নিষ্পত্তির উপলক্ষে বরিশালে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন বিদেশে অসময়ে আহারাদির জন্য তিনি অর্শরোগে আক্রান্ত হ'ন। এই অর্শ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ভগন্দর ও মলনালীর সঙ্কোচতা উৎপাদন করে। নগেন্দ্রনারায়ণ পীড়ার দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও পত্নিপ্রাণার প্রাণপাত শুশ্রূষায় কি যে আরাম উপভোগ করিতেন তাহা তিনি সর্ব্বদা সকলের নিকট ব্যক্ত করিতেন। স্বামীর ঔষধ, পথ্য ও সেবা তিনি অনন্যপরায়ণ হইয়া করিতেন। ভক্ত যেমন আরাধ্য দেবতার সেবা করে, বসন্তকুমারী তাদৃশ প্রেম ও ভক্তি সহকারে পতিসেবা করিতেন। এই সেবা তাঁহার দুই এক দিন, দুই এক মাস বা দুই এক বৎসরের জন্য নহে, ইহা তিনি আজীবন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অন্তর কি যে প্রীতি ও প্রফুল্লতা অনুভব করিত তাহা তাঁহার মুখেই সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইত। আজকালকার দিনে পতির কিংবা পত্নীর গুরুতর অসুখ হইলে বাহিরের পাঁচ জনেই সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকে, যাঁহার বাহিরের লোকের অভাব, তাঁহার নার্স বা শুশ্রূষা-কারিণী বেতন দিয়া আনাইতে হয়। ললিতা বিলাসবতীরা কিংবা বসন্তোপসেবী নাগরগণ কি পীড়িতের শুশ্রূষা করিয়া জীবন বিফল করিতে পারেন? পত্নী ও পতি উভয়ে উভয়ের সুখের সঙ্গী বটে, দুঃখের সঙ্গী নহেন। কিন্তু প্রকৃত দাম্পত্য তাহা কি? বিবাহের মন্ত্রে উভয়ে উভয়ের এক ও অভিন্ন হৃদয় হইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত জীবনে তাহা বড় দেখা যায় না। বসন্তকুমারী নীরব জীবনযাপনে দাম্পত্যের একপ্রাণতা অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা ও প্রেমে তিনি স্বামীকে একেবারে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। পতিও পত্নীকে কত প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন তাহা কেবল বসন্তকুমারীর পরলোকপ্রাপ্তির দিন লোকে জানিতে

পারিয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃত প্রেমের উৎস নীরব, উহাতে উচ্ছ্বাস বা তরঙ্গপ্রচণ্ডতা নাই। কাহারও কাহাকে ভালবাসি মুখে বলিতে হয় না। বসন্তকুমারী নগেন্দ্রনারায়ণকে এতদূর শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল বাসিতেন যে তিনি তাহাকে কথনও 'তুমি' বলেন নাই। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে ছিল স্বামী কথনও খেলার সঙ্গী কিংবা বিলাসের উপকরণ নহেন, তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ উচ্চতর, পবিত্র ও ইহকালের ও পরকালের। ফলতঃ কর্ত্তব্য ও প্রেম উভয় সুচারুভাবে মিলিত হইয়া বসন্তকুমারীর পতিপ্রেম আজীবন ফল্গুনদীর ন্যায় সাধারণের অদৃশ্যভাবে সংসার পবিত্র করিত।

নানা চিকিৎসায় ও যখন আরোগ্য লাভ না করিয়া নগেন্দ্রনারায়ণের পীড়া ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিল, তথন জননী ও আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শ মত তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। শ্বশ্রূমাতা বধূর প্রকৃতি জানিতেন, তাই গৃহরক্ষার জন্য নিজে বাড়ীতে থাকিয়া বধূকে পুত্রের সেবা ও শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে পাঠাইলেন। বসন্তকুমারী শ্বশ্রূমাতার সুবিচারে পরম প্রীত হইয়া পতিসঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ অন্যত্র ভাল বাসাবাটী না পাইয়া শ্বশুর বাটীর নিকটেই একটী ছোট বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বসন্তকুমারী পিতৃগৃহে অবস্থান করত প্রতিদিন প্রায় সব সময়ই স্বামীর গৃহে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সেবায় রত থাকিতেন। নগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ভৃত্য গোবিন্দচন্দ্র দাস ও প্রতিপালয়িত্রী পদ্মমণিদেবী থাকা সত্ত্বেও বসন্তকুমারী স্বামীর সমুদয় কার্য্য নিজেই করিতেন। ইহা না করিতে পারিলে তিনি তৃপ্ত হইতেন না। কেবল যে প্রেম ও কর্ত্তব্যতা-প্রযুক্ত তিনি স্বামীর সেবা করিতেন তাহা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে, কেন না তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিলে মনে হইত সুশিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীও তাঁহার মত কার্য্যক্ষমা নহেন। কি পথ্য রন্ধন, কি

শয্যাপরিষ্কার রাখা, কি গাত্রাদিমর্দ্দন, কি মল-মূত্রাদি ত্যাগে সাহায্য-করণ, সর্ব্ব বিষয়ে তিনি সুদক্ষা ছিলেন। তারপর নানারূপ সুমিষ্ট কথায় রোগীর চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে তাঁহার মত আর কোনও নারীর কথা আমরা বিদিত নই। বস্তুতঃ শুশ্রূষা কার্য্যে বসন্ত-কুমারী অনন্যসাধারণ ছিলেন। কলিকাতায় নানারূপ চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইল না বটে, তবে বৃদ্ধির উপশম হইয়া যন্ত্রণার অনেকটা লঘুতা হইল। তখন আবার বাটীতে কার্য্যের গুরুতা নিবন্ধন নগেন্দ্রনারায়ণের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল, কাজেই তিনি বসন্তকুমারীকে সঙ্গে করিয়া রায়েরকাঠীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শ্বশ্রূগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বসন্তকুমারী আবার গৃহকার্য্যের ভার গ্রহণ করত শ্বশ্রূমাতাকে সুস্থ করিলেন। এখানে তিনি যেমন সমগ্র গার্হস্থ্য কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন, তেমনি শ্বশ্রূমাতার পূজার্চ্চনা প্রভৃতিতে সমুদায় জিনিশ পত্র গুছাইয়া দিতেন। আবার অবকাশ মত সীবন, বুনন প্রভৃতি কার্য্য নিজে করিতেন ও পরিবারস্থ ও প্রতিবেশীর আত্মীয় কন্যাগণকে শিখাইতেন। পশম ও সূতার বুনন কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার প্রস্তুত আসন, খুঞ্চাপোষ, টেবিল-ঢাকা, ফুলদান, কম্ফর্টার প্রভৃতি জিনিশের ঐ সব কার্য্যে সুদক্ষ মেমগণ পর্য্যন্ত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কেবল পরিবারস্থ সকলের জন্য কেন, তিনি জ্ঞাতিদের, এমন কি বাহিরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকেও তাঁহার নির্ম্মিত শিল্পকার্য্য উপহার দিতেন। কৈশোরে পিত্রালয়ে বাসকালে তিনি ভ্রাতৃ জায়ায় নিকটে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিদাসের মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু এক্ষণে অবকাশ মত সংস্কৃত রামায়ণের বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ ও সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালি-সিংহ কৃত বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতেন ও দেবর পত্নীদের ও অন্যান্য প্রতিবেশিনী বধূও ও দেবর-কন্যাগণকে শিক্ষা দিতেন। তিনি

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী হইতে মোহমুদ্গর, শিবস্তোত্র প্রভৃতি এবং গীতার প্রথম তিন অধ্যায় মুখস্থ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ তিনি পূর্ব্বাহ্ণে গুরুগীতা, গীতার এক অধ্যায়, মোহমুদ্গর, গঙ্গালহরী প্রভৃতি আবৃত্তি না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ছন্দঃ-শাস্ত্রে পারদর্শিনী না হইলেও তাঁহার আবৃত্তি বড়ই মধুর হইত, এবং যে শুনিত সে তন্ময় না হইয়া থাকিতে পারিত না। দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁহার আহ্নিক কার্য্যে বড়ই ঐকান্তিকতা দৃষ্ট হইত। সময়ে সময়ে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে বাহিরের কোনও বিষয়েই লক্ষ্য থাকিত না।

স্বামিগৃহে বাসকালে বসন্তকুমারীর প্রতিদিন স্থূলতঃ নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করণীয় ছিল। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জাগরিত হইয়া প্রত্যূষে পাঠ্য স্তোত্রগুলির আবৃত্তি করিতেন। উহার পর ভগবান্ কৃষ্ণের ১০৮ নাম আবৃত্তি করিয়া স্বামীর পদধূলি লইয়া শয্যা ত্যাগ করিতেন। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেন। অতঃ-পর শ্বশ্রূমাতার পূজা ও অর্চ্চনার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। পরিবারস্থ সকলের ভোজনান্তে নিজে ভোজন করিতেন। মধ্যাহ্ণে ভোজনাবসানে বিশ্রামকালে যাহারা তাহার নিকটে আসিত তাহাদিগকে সূতার ও পশমের কার্য্য শিখাইতেন। এই শিক্ষাদান সময়ে তাহাদিগকে পরোপকারচিকীর্ষা, সত্যনিষ্ঠা, নারীজাতির কর্ত্তব্য গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতেন। তিনি দেব ও দ্বিজে অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। পরনিন্দাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। রন্ধন কার্য্যেও তিনি বিশেষ দক্ষা ছিলেন। অল্প ব্যয়ে কিরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় ও অল্প ব্যয়ে কিরূপে অতিথিকে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় আহার্য্য দ্রব্য-সম্ভার পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে হয় তাহা বসন্তকুমারীই জানিতেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ৫০ টাকা ব্যয় করিয়া দুইজন

অতিথিকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা সকলেই করিতে পারেন। কিন্তু বসন্তকুমারী প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় কোনও দ্রব্য অপচয় না করিয়া অথচ অপর্য্যাপ্তরূপে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও অতিথিকে তৃপ্তিপূর্ব্বক খাওয়াইতে জানিতেন। এইজন্য তাঁহার পতিগৃহে রাত্রিতেও কোন অতিথি সহসা আগত হইলে তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া গৃহপতির ভূরি প্রসংশা করিতেন। নিমন্ত্রণ স্থলে দেড় শত লোকেরও তিনি একা রন্ধন ও পরিবেশন করিতে পারিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পতি সঙ্গে তীর্থযাত্রা।

১৩১১ সালের ফাল্গুন মাসে ৺শিব চতুর্দ্দশী উপলক্ষে বসন্তকুমারী স্বামীর সঙ্গে চন্দ্রশেখর তীর্থক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে গিয়া ভগবান্ চন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ, বিরূপাক্ষ, ঊনকোটি শিব, হরগৌরী প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হ'ন। তথায় ব্যাসকুণ্ড, বাড়বানল, সহস্রধারা, লবণাক্ষ প্রভৃতিতে স্নান করিয়া তিনি কি যে তৃপ্তিলাভ করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তীর্থক্ষেত্রে তিনি এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে তাহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ অবাক্ হইয়া যাইতেন। তীর্থক্ষেত্রে বসন্তকুমারীর দেবতার প্রতি ভক্তি ও ঐকান্তিকতা দেখিয়া এমন কি সহযাত্রিকগণ ও পাণ্ডাগণ পর্য্যন্ত একবাক্যে তাঁহাকে অসাধারণ মানুষ বলিতেন। সে যাত্রা তাঁহাদের সঙ্গে রায়েরকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন বসু সস্ত্রীক, স্বামীর প্রতি-পালয়িত্রী পদ্মমণি ও কাশী নিবাসী জগন্নাথ পাণ্ডা ও রায়েরকাঠী-নিবাসী বসন্তকুমার বার ছিল। বসন্তকুমারী নিজের দেবদর্শন ইত্যাদি

কার্য্যের মধ্যেও সহযাত্রিকদিগকে এতদূর যত্ন ও সেবা করিতেন যে তাঁহারা অদ্যাপি সহস্রমুখে তাঁহার সাধুবাদ করিয়া থাকেন।

প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দুনারী তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন। অবশ্য সকলেরই যাত্রা ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঠিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম কয়জনের হইয়া থাকে? বসন্তকুমারী সাধারণ যাত্রিকদের মত তীর্থ করিতেন না। সর্ব্বত্র তিনি যেমন বিগ্রহ দর্শন করিতেন, তেমনি শাস্ত্রানুমত সমুদায় ক্রিয়াকলাপ প্রাণের সহিত সম্পাদন করিতেন। কোন কার্য্যই না বুঝিয়া কেবল পুরোহিতের কথামত করিয়া যাইতেন না। আবার হৃদয়ের মধ্যে যতক্ষণ ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিতে না পাইতেন ততক্ষণ সেইখানেই ধ্যানস্থ থাকিতেন। পাণ্ডাদের বুজ্‌রুকিতে মুগ্ধ হইয়া তিনি কখনও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেন না। এই জন্য এক চন্দ্রশেখর তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ভারতের প্রায় সমুদায় তীর্থসংক্রান্ত অশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন কাহারও নিকটে তীর্থবার্ত্তা বিবৃত করিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে এক দিব্য-জ্যোতিঃ পরিদৃষ্ট হইত। তিনি যেন আবিষ্টা হইয়াই সমুদায় বলিয়া যাইতেন, শ্রোতাও বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। বস্তুতঃ আমাদের তীর্থগুলি চিরদিনই একরূপ আছে। কেবল প্রকৃত দর্শকই তথায় আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীই বৃন্দাবনে ধ্যানযোগে কৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, মহাত্মা পরমহংসদেবই ধ্যানযোগে সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে দেখিতে পাইতেন। তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে সাধক না হইলে তীর্থে গিয়া কিছুই লাভ নাই, গৃহ ও তীর্থ দুই সমান। চৈতন্য-চন্দ্রের তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি নীলাচলে দাঁড়াইয়া নীলসাগরে যমুনালীলা দেখিয়াছিলেন। প্রকৃত দৃষ্টি স্ফুরিত না হইলে, অন্ধের সর্ব্বত্র দিন-রাত্রি সমান।

বসন্তকুমারীর শরীর স্বভাবতঃ বেশ সুস্থ ছিল। রায়েরকাঠীতে বাস-

কালে তিনি একবার কঠোর জ্বরে আক্রান্ত হ'ন। পিরোজপুরের গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্তচক্রবর্ত্তী ও রায়েরকাঠী নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়দ্বয়ের সুচিকিৎসায় তিনি ৪৫ দিনে আরোগ্যলাভ করেন। উক্ত পীড়ায় তিনি এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিন মাস পর্য্যন্ত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিতেন না। রায়েরকাঠীতে ইহাই তাঁহার গুরুতর অসুখ, উহা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কোনও অসুখ হয় নাই। আমরা বলি সুশিক্ষার গুণে তিনি নানাকার্য্যের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি রক্ষা করিতেন বলিয়া স্বভাবতঃ সুস্থ শরীরে থাকিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পতির চিকিৎসার জন্য পুনরায় কলিকাতায় আগমন।

বসন্তকুমারী পীড়া হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া আবার যখন গৃহশ্রীর আসন গ্রহণ করিলেন, তখন নগেন্দ্রনারয়ণের পূর্ব্বের অসুখ আবার বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় যাওয়া নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িল। শ্বশ্রূমাতা বধূর সেবা ও শুশ্রূষার ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও স্বামিভক্তির কথা পূর্ব্বেই জানিতেন, তাই এবারও নিজে সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন ও পুত্রবধূসহ পুত্রকে চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। জননী তখন জানিতে পারেন নাই যে নগেন্দ্রনারায়ণের অসুখ এবার পূর্ব্ববারের স্থায় সহজসাধ্য হইবে না, তাহা হইলে নিজেও সঙ্গে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

নগেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় আসিয়া সুবিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসায় অদ্বিতীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (পশ্চাৎ লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল) মহাশয়ের চিকিৎসাধীন রহিলেন। সুরেশবাবু দেখিয়াই বলিলেন যে অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যতীত উহার আর কোনওরূপ চিকিৎসা নাই, আর তাহাও অতিশয় গুরুতর *। তিনি নানাবিধ ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগে রোগীকে অস্ত্র-চিকিৎসা সহ্য করিবার মত সবল করিতে লাগিলেন। এ সময়ে বসন্তকুমারীর মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা এক অন্তর্য্যামীই জানিতেন। একে স্বামীর গুরুতর পীড়া, তাহাতে দারুণ অস্ত্র-চিকিৎসা হইবে, ইহা ভাবিতেও কামিনী-কুসুম শুকাইয়া যায়। কিন্তু বসন্তকুমারী সীতার ন্যায় কুসুমকোমলা হইলেও সাবিত্রীর ন্যায় স্বামীর জন্য দারুণ দাবানলেও প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন। পতিপ্রাণা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রাণপণে সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা স্বামীকে সবল করিয়া তুলিলেন ও সেই দারুণ অস্ত্রপ্রয়োগের দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পতিভক্তির দৃঢ়তা এত নিগূঢ় ছিল যে তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারিতেন না যে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পতির কিছু গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে। বাস্তবিক এই সাবিত্রীর দেশে প্রতিপত্নীরই পতিসম্বন্ধে এরূপ ধারণা অমূলক নহে। যে দেশে পত্নী পতির সুখ ও দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করেন না, এমন কি যাঁহার প্রাণ পতির প্রাণের সঙ্গে গ্রথিত অর্থাৎ পতির মৃত্যুতে যাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়, সে দেশের নারীর পক্ষে ঈদৃশ ধারণা কখনই ভ্রান্ত বা অমূলক হইতে পারে না।

অবশেষে সেই বিষম দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। চিকিৎসকগণ সমভিব্যাহারে ডাক্তার সর্ব্বধিকারী আসিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল

* তখনকার মেডিকেল কলেজের প্রধান অস্ত্রচিকিৎসক সুবিখ্যাত ওব্রায়েন সাহেবকেও দেখান হয়, তিনিও তাহাই বলেন।

নানারূপ আয়োজনের পর অপারেসন করিলেন। সে অপারেশন স্বরেশ বাবুর অগাধ সার্জারি বিস্তার একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন। অপারেশন প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী হইয়াছিল। বসন্তকুমারী তখন সাবিত্রী দেবীর ন্যায় ত্রিরাত্র ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বামীর জীবন ও মরণের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন কিনা তাহা তিনি কাহাকেও কখনও বলেন নাই। তবে তখন যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল তাহারা সকলেই তাঁহার চেহারায় এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এই ভীষণ অপারেশনের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে কেহই তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের তরেও স্বামীর নিকট হইতে দূরে যাইতে দেখে নাই। তিনি স্নানাহার করিতেন কিনা কাহারও উহার তত্ত্ব লইবার অবকাশ ছিলনা। তবে ডাক্তার সুরেশপ্রসাদের অপারেশনের পরের মন্তব্য দ্বারা আমরা অবগত হই যে সাধ্বী পতিপ্রাণার আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতীত নগেন্দ্রনারায়ণ কিছুতেই তাদৃশ দারুণ অপারেশনের পরে জীবিত থাকিতে পারিতেন না, কেননা সুরেশবাবু অপারেশনের পরে নগেন্দ্রনারায়ণকে জীবিত দেখিয়া নিজেই হর্ষ ও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন (২)। অপারেশনের পরে শুশ্রূষা আরও কঠোরতর হইল। কিন্তু পতিব্রতা কিছুতেই বেতন গ্রহণকারিণী শুশ্রূষাকারিণী (Nurse) আনিতে দিলেন না। তিনি দিবারাত্র স্বামীর সর্ব্বাবধ সেবা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন (৩)। নগেন্দ্রনারায়ণ বলেন যে তাঁহার স্ত্রী সেই সময়ে তাঁহার যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছেন জগতে বোধ হয় আর কেহ কাহারও তাদৃশ শুশ্রূষা করিতে পারিবে না।

(২) তিনি উহার দশ দিন পরে বলিয়াছিলেন, অস্ত্র করিবার পর চেহারা দেখিয়া আমি বড়ই ভীত হইয়াছিলাম।

(৩) সেই সময়ে তাঁহার মাসীমাতা হেমাঙ্গিনী, মাতামহ কালীবাবু, প্রতিপালক মহিমাচন্দ্র, প্রতিপালিকা পদ্মমণি, শ্যামপুকুরের মাসীমাতা ও মাসতুত ভ্রাতা, বিশেষতঃ তাঁহার শ্বশ্রূমাতা এবং সম্বন্ধী ডাক্তার বিনোদবাবু সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

কুসুমকোমলা নারী যে কিরূপে এইরূপ বহুকাল যাবৎ অহোরাত্রব্যাপী অক্লান্ত অশ্রান্ত ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য শুশ্রূষা করিতে পারে তাহা তিনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই। প্রতিমুহূর্ত্তে রোগীর সেই হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদ, সেই প্রতিপদে নিরর্থক ভৎর্সনা, উহার মধ্যেও বসন্তকুমারীর সেই হাস্যমুখে নানারূপ সান্ত্বনা বাক্য, সেই প্রতিমুহূর্ত্তে রোগীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পাদন ইত্যাদি অতিকঠোর পরীক্ষায় যিনি সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে স্বামীর অবিশ্বাসে জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ কিছুই গুরুতর নহে। কে বলে হিন্দুপত্নী ক্রীতদাসী, হিন্দুপত্নী অন্তঃপুরবদ্ধা বিহঙ্গিনী? তাহারা জানেনা হিন্দুগৃহের লক্ষ্মী, হিন্দুগৃহের সাক্ষাৎ দেবতা হিন্দুপত্নী। বিধাতার ললনানির্ম্মাণের প্রকৃত রহস্য হিন্দুনারীতে পূর্ণ প্রকটিত। ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়ম যখন দারুণ বসন্তরোগে মৃতকল্প তখন রাজমহিষী মেরীই তাঁহার অপার্থিবপ্রেম ও প্রাণঢালা শুশ্রূষার দ্বারা শমনের করাল কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহারাজ উইলিয়ম তাঁহার ডাইরিতে মহিষীর সেই অলোকসামান্য শুশ্রূষার উল্লেখ করিয়া কত গৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে আত্ম-কাহিনী লিখিবার পদ্ধতি নাই, তাই আমরা নারীর নীরব প্রণয় ও শুশ্রূষার কাহিনীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারি না। আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার নায়িকা শমনের সঙ্গে কিরূপ দারুণ দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া স্বামীর জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার পতি জীবিত না থাকিলে আর কেহই উহার সাক্ষী থাকিত না।

দুই বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়া সুরেশবাবুর সুচিকিৎসায়, সর্ব্বোপরি বসন্তকুমারীর অতুলনীয় সেবা ও শুশ্রূষায়, নগেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুর দ্বার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরীর সুস্থ হইল, কিন্তু তিনি রোগ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বধূ হাসিমুখে স্বামীকে পুনরায় শ্বশ্রূমাতার পাদ-

প্রান্তে উপস্থাপিত করিলেন। শ্বশ্রূমাতাও পুত্র ও পুত্রবধূর শিরোঘ্রাণ করিয়া হৃদয়ের অপার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে বসন্তকুমারী একদিন পিত্রালয় হইতে চিঠি পাইলেন যে তাঁহার জননী নিতান্ত পীড়িতা। মাতৃবৎসলা বসন্তকুমারী মাতার গুরুতর পীড়ার বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আকুল হইয়া পড়িলেন। এদিকে পতির সংসারেও তাঁহার অনুপস্থিতি বড়ই সঙ্কটময়, কেন না গৃহস্থালীয় সমুদায় ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত ছিল। সর্ব্বোপরি নগেন্দ্রনারায়ণের শুশ্রূষা বসন্তকুমারী ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য ছিল না। নগেন্দ্রনারায়ণ এক্ষণে সুস্থ ও সবল থাকিলেও, সুরেশবাবুর ব্যবস্থামত প্রত্যহ তাঁহার কতগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত, তাহা বসন্তকুমারীর ন্যায় একজন পতিপরায়ণা ও শুশ্রূষাদক্ষা নারী ব্যতীত অপরের নিতান্ত অসাধ্য ছিল। পতিপ্রাণা জননীর জন্য নিতান্ত কাতর হইলেও, প্রাণপতির অসুবিধা বিবেচনায় মুখে কোনও কথা উচ্চারিত করিলেন না। কিন্তু পতি পত্নীর হৃদয়ব্যথা বুঝিয়া নিজেই উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় জননীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। জননীবৎসলা বসন্তকুমারী কলিকাতায় আসিয়া নিজের সাধ্যাতীতরূপে রুগ্না মৃত্যুশয্যাশায়িনী মাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শাশুড়ীর তাদৃশ অবস্থার কথা জানিয়া নগেন্দ্রনারায়ণও কলিকাতায় আসিলেন। বসন্তকুমারী প্রাণপণ সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াও এ যাত্রা জননীর প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে কালের শৃঙ্গ-রবে নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিব্রতা দিব্য পতিধামে চলিয়া গেলেন। জননীবৎসলা বসন্তকুমারী জননীর পরলোকগমনে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। মাতা ও পিতা উভয়েরই শোক যুগপত্‌ তাহার চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু তিনি চিরদিনই আত্মসংযমে নিরতা ছিলেন, তাই শোকে মূহ্যমান হইয়া জননীর পারলৌকিক কার্য্যে উদাসীন হইলেন না। তিনি

মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটস্থিত পতির বাসাবাটীতে আসিলেন এবং চতুর্থ দিবসে বংশানুরূপ জননীর শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় বার তীর্থযাত্রা।

শ্রীযুক্তা জগত্‌মোহিনী পতি মাধবনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তির পর হইতেই সংসারে বীতস্পৃহ ও উদাসীন ছিলেন। গুণবতী পুত্রবধূর সেবা ও শুশ্রূষায় এবং তাঁহাকর্ত্তৃক সাংসারিক সমুদয় কার্য্যভার গৃহীত হওয়ায় তিনি ক্রমশঃ সংসারে একেবারে নির্লিপ্ত হইতে লাগিলেন। দিবারাত্র ভগবৎ-পূজার্চ্চনা ও স্বামি-পাদপদ্ম-চিন্তা ব্যতীত তাঁহার আর কিছুতেই মন স্থির হইত না। এতদিন পুত্রগণ সকলে নাবালক ছিলেন বলিয়াই তিনি গৃহত্যাগ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে পুত্রগণ সকলে সাবালক হইয়া বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছে দেখিয়া স্বামীর পরিত্যক্ত বিত্ত-সম্পত্তি চারিপুত্রের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়া নিজে তীর্থাদি পরিভ্রমণ ও ধর্ম্মকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অবশেষে ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি বিত্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া তীর্থভ্রমণ মানসে রায়েরকাঠী ত্যাগ করিলেন। নগেন্দ্র-নারায়ণ ও বসন্তকুমারী মাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। বসন্তকুমারী সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা শ্বাশুড়ীর মনোব্যাকুলতা দূর করিতে লাগিলেন। জগত্‌মোহিনী অহর্নিশ পতিপদধ্যানে রায়েররকাঠী হইতে যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন বড়ই পীড়িত ছিলেন। এক্ষণে বসন্তকুমারীর অসাধারণ সেবা ও শুশ্রূষায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পৌষ মাসে তিনি

পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ, পুত্রবধূ বসন্তকুমারী, ভগিনী তরঙ্গিনী ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেবের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রথমে বৈদ্যনাথধামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শিবলিঙ্গ, তপোবন, ত্রিকূট পাহাড় প্রভৃতি দর্শন করতঃ দানার্চনাদির অন্তে বারাণসীধামে যাত্রা করিলেন। ৺কাশীধামে পৌঁছিয়া বাবা বিশ্বনাথ ও অন্যান্য বিগ্রহাদি দর্শন, বিগ্রহের পূজা, কুমারী ও সধবাস্ত্রী পূজা ও দান ইত্যাদি কার্য্য সমাপন করিলেন এবং তথায় প্রায় ১৭।১৮ দিন অবস্থান করিয়া কাশীস্থ সমুদয় বিশিষ্ট বিগ্রহ এবং পুণ্যস্থলসকল দর্শন করিলেন। তৎপরে 'অর্দ্ধোদয়' যোগ উপলক্ষে প্রয়াগে গমন করেন। তথায় যোগের দিন ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া দানাদি কার্য্য সমাপন করেন। প্রয়াগে দ্বাদশ দিন বাস করিয়া তথাকার যাবতীয় বিগ্রহাদি ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় বসন্তপঞ্চমী উৎসব দর্শনে যাইয়া, রাধাগোবিন্দ, গোপীনাথ, রাধারমণ প্রভৃতি সমুদয় বিশিষ্ট বিগ্রহ দর্শন করিলেন। শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডও গিরিগোবর্দ্ধন দর্শনপূর্ব্বক তথাকার পূজা ও স্নানদানাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। অতঃপর বৃন্দাবন পরিক্রমণ করিবার পরে জগত্‌মোহিনীর ইচ্ছা হইল জয়পুরে গিয়া রাধাগোবিন্দ দর্শন করেন ও ব্রহ্মার পবিত্র সরোবর পুষ্করতীর্থে অবগাহন ও সাবিত্রী সন্দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন।

মাতার ইচ্ছা জানিবামাত্র পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ মাস্‌তুত ভাই চুনীবাবুকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। নিজের শরীরের অপটুতাবশতঃ তিনি জননীর সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। তিনি, বসন্তকুমারী ও মাসীমাতা তথায় রহিয়া গেলেন। তাঁহারা অবসরমত বৃন্দাবনে নিধুবন, নিকুঞ্জ-কানন, বেলবন, মাঠবন, মানসরোবর প্রভৃতি পুরাণোক্ত পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। জগত্‌মোহিনী রাধাগোবিন্দ, পুষ্কর ও সাবিত্রী দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর,

তাঁহারা সকলে আবার একত্র হইয়া মথুরায় যাত্রা করিলেন। মথুরায় গিয়া তাঁহারা সমুদায় বিগ্রহ ও তীর্থ স্থানগুলি দর্শন, পূজা ও দান ইত্যাদি করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

এই সব তীর্থস্থানেও বসন্তকুমারীর মধ্যে সর্ব্বদা একটি বিশিষ্টতা লক্ষিত হইত। প্রায় প্রতিতীর্থেই তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি যেন কি এক অভিনব দিব্যতত্ত্বের সন্ধান পাইয়া সহসা তন্ময় হইয়া যাইত। প্রয়াগে ত্রিবেণীতে স্নান সময়েও তিনি আবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া অবধি তাঁহার চিত্ত আর পার্থিব বিষয়ে আদৌ লিপ্ত ছিল না। তিনি এত অধিক আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন যে পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতার জয়পুর পুষ্কর প্রভৃতি যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার সঙ্গে যাইতেও চাহিলেন না। বৃন্দাবনে প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় তিনি নিশ্চয়ই শ্যামসুন্দরের সাক্ষাত্‌কার পাইয়াছিলেন। তিনি দিবানিশি ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। তীর্থ বল আর যাই বল, চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক দর্শন হয় না। ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে নিবিষ্ট চিত্তে প্রার্থনা করিলেই ভক্তবৎসল ঠাকুর ভক্তের অদৃশ্য থাকেন না। তীর্থক্ষেত্রে আমাদের সেই ঐকান্তিকী ভক্তি জাগরিত হইয়া তাঁহাকে দিব্যনয়নের গোচর করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করিয়া দেয়।

নগেন্দ্রনারায়ণ প্রায় ১৮।২০দিন শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া তথায় কিছুদিন বাস করিবার পর পত্নীসহ রায়ের কাঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জননী কলিকাতায়ই রহিয়া গেলেন।

১৩১৫ সালের মাঘ মাসে তিনি সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া জননী ও মাতৃস্বসার সহিত শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বৈতরণীতে অবতরণ করিয়া তথায় তীর্থকার্য্য সমূহ সমাপনান্তে পুনরায় ট্রেণে আরোহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমধাম গমন করেন। পুরীতে শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রামূর্ত্তি দর্শনে জীবন চরিতার্থ করিলেন। ক্রমশঃ শ্রীধামে সাগর-

তীরস্থিত চক্রতীর্থ, মহাবীর, লোকনাথ মহাদেব প্রভৃতি দর্শন ও তত্রত্য কৃত্যগুলি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে পাপীর চিত্তও আশার সুরসসঞ্চারে পরিপ্লুত হয়, যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহাদের কথা আর কি বলিব! বসন্তকুমারী প্রভৃতি এই মহাক্ষেত্রে কিছুদিন বাস করিবার জন্য মনস্থ করিয়া ৫।৬ দিন নানা স্থান ও বিগ্রহ দর্শন এবং তীর্থকৃত্যাদি সম্পাদনে অতিবাহিত করিতে না করিতে নগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার খুড়তত ভাই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন যে নগেন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় ভ্রাতা জীবেন্দ্রনারারণ সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, নগেন্দ্রনারায়ণের অবিলম্বে গৃহে গমন আবশ্যক। টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহারা সকলে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় আসিয়াই মাতা ও স্ত্রীকে কলিকাতায় রাখিয়া সেই দিনের ট্রেণেই দেশে রওনা হইলেন। বাড়ী গিয়া ভ্রাতাকে আর দেখিতে পাইলেন না। ইতিমধ্যেই দারুণ কালাজ্বরে জীবেন্দ্রনারায়ণের জীব-লীলা শেষ হইয়াছিল।

নগেন্দ্রনারায়ণ বড়ই বিপদে পড়িলেন। একে সহোদরের সহসা পরলোক প্রাপ্তির জন্য হৃদয়বিদারক শোক, তারপর ভ্রাতার নাবালক সন্তানসন্ততিদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সদ্যঃশোকাতুরা ভ্রাতৃজায়ার সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা। নগেন্দ্রনারায়ণের শরীরের অবস্থাও সুপটু ছিলনা। তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। এইরূপে তিন চারি দিন অতীত হইল। প্রথম শোকাবেগে তিনি তাঁহার পত্নী ও তাঁহার অসাধারণ শুশ্রূষাদক্ষতার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ক্রমে পত্নীর কথা মনে উদিত হইল। তিনি তাঁহাকে রায়েরকাঠীতে আনয়ন করিয়া তাঁহার উপরে নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণের এবং শোকাতুরা ভ্রাতৃজায়ার ভার ন্যস্ত করিবার মানস করিলেন। তাই

অবিলম্বে বাটীর সময়োচিত ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং বসন্তকুমারীকে লইয়া রায়ের কাঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বসন্তকুমারী হৃদয়ের শোকাবেগ দমন করিয়া সদ্যঃ শোকদগ্ধা দেবরপত্নী ও নাবালক দেবরপুত্র ও কন্যাদের ভার গ্রহণ করিলেন। বসন্তকুমারীর সুপটু ও প্রাণঢালা যত্ন ও চেষ্টায় শোকান্ধকার গৃহে ক্রমে একটু একটু করিয়া শান্তির আলোক প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ছেলেরা তাঁহার স্নেহে পিতৃশোক একরূপ বিস্মৃত হইল। আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে জগৎমোহিনী যখন সংসারে বিতৃষ্ণা হইয়া গঙ্গাতীরে গমন করেন তখন তিনি প্রতিপুত্রকেই বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে বসতিবাটীও বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে নগেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ পৃথক্-অন্ন ছিলেন। জীবেন্দ্রনারায়ণের পরলোক প্রাপ্তির পর বসন্তকুমারী দেবরপত্নী ও দেবর সন্তানসন্ততিগণকে নিজের কাছে রাখিয়া একান্নবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, জীবেন্দ্রনারায়ণের পুত্রকন্যাগণ তাহাকে 'বড় মা' বলিয়া ডাকিত।

১৩১৬ সালের পৌষসংক্রান্তির উপলক্ষে বসন্তকুমারী স্বামী, শ্বশ্রূমাতা, মাসতুত দেবর শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, তাঁহার মাতা ও মাসতুত দেবর-পত্নী শ্রীমতী চারুশীলার সঙ্গে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী ত্রিবেণীতে স্নানের জন্য যাত্রা করেন। ঐ উপলক্ষে তাঁহারা তিনরাত্রি ত্রিবেণীতে বাস করিয়া বাঁশবাড়ীয়ার সুপ্রসিদ্ধা হংসেশ্বরী দেবী ও সাধকশ্রেষ্ঠ দরাপ-খাঁর দরগা দর্শন করেন। তীর্থযাত্রা ও ঠাকুর দর্শন বসন্তকুমারীর বড়ই প্রীতিকর ছিল। সাধারণতঃ আমাদের নারীগণ বস্ত্র ও আভরণের অনুরাগিণী, কিন্তু বসন্তকুমারী বস্ত্র কিংবা আভরণের আদৌ অনুরাগিণী ছিলেন না। পরোপকার, তীর্থদর্শন, ধর্ম্মাচরণ, ক্ষুধার্ত্তকে উদর পূরিয়া আহার দান ও গুরুজনের সেবাশুশ্রূষায় তাঁহার বড়ই অনুরাগ ছিল, এবং ইহাতে তিনি যেরূপ প্রীতি ও তৃপ্তি অনুভব করিতেন সেরূপ আর

কিছুতেই নহে। নগেন্দ্রনারায়ণও পত্নীর প্রীতির জন্য অবসর পাইলেই তাঁহাকে লইয়া কোনও না কোন তীর্থস্থানে গমন করিতেন, কিংবা ঠাকুর দর্শন করাইয়া আনিতেন।

১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে বসন্তকুমারী স্বামী, শ্বশ্রূমাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বারাণসীধামে গমন করেন ও প্রায় ১৫ দিন যাপন করেন। তথায় স্নান, অর্চ্চনা ও দানাদি করিয়া বসন্তকুমারী যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বসন্তকুমারীর তীর্থ দর্শন সাধারণ স্ত্রীলোকের তীর্থদর্শনাপেক্ষা ভিন্ন রকমের ছিল। তিনি তীর্থবাসকালে তৎসংক্রান্ত কথা, উহার চিন্তা ও তীর্থস্থানের বিভিন্ন বিগ্রহ দর্শন ব্যতীত সংসারবিষয়ক অন্য কোনও কথার মধ্যে থাকিতেন না। পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে তাঁহার চিত্ত খালি তন্ময় হইয়া যাইত। তিনি প্রায় প্রতি বিগ্রহেই তদধিষ্ঠিত দেবতার উপস্থিতি অনুভব করিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। দেবতার ধ্যানের মন্ত্রগুলির সত্যতা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া অপার্থিব আনন্দে মগ্ন হইয়া যাইতেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন যে যাঁহার চক্ষু আছে তিনি প্রতিতরুতে, প্রতিপুষ্পে. এমন কি প্রতিসলিলতরঙ্গভঙ্গীতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন। আমরাও বলি যে যাঁহার নেত্রযুগল ভক্তির পূতসুধায় মার্জ্জিত হইয়াছে তিনি প্রতিবিগ্রহে, প্রতি-তীর্থসলিলে, এমন কি প্রতিপুণ্যস্থানে তাঁহার অন্তরের দেবতার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হ'ন। ইহা মোহ বা ইন্দ্রজাল নহে, ইহা অটুট প্রত্যক্ষ সত্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্নেহ নিদর্শন।

বসন্তকুমারী আজীবন নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার দেবর জীবেন্দ্র-নারায়ণের দ্বিতীয় কন্যাকে তিনি আশৈশব লালনপালন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা পৃথক্-অন্ন হন নাই। কন্যাটিও জ্যেঠাইমাকে জননীর ন্যায় ভালবাসিত এবং তাহার পিতা ও জ্যেঠামহাশয়দের মধ্যে পশ্চাৎ পৃথক্-অন্ন হইয়া গেলেও প্রায়ই সে জ্যেঠাইমার কাছে থাকিত। বসন্তকুমারী তাঁহার হৃদয়ের সমুদায় মাতৃস্নেহ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। বালিকা যখন কথা কহিতে আরম্ভ করিল তখন হইতে বসন্তকুমারীকে 'মা জননী' বলিয়া ডাকিত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসন্তকুমারী তাহার নাম রাখিলেন সুষমা। সুষমা তাহার গর্ভধারিণী অপেক্ষা মাজননীকে অধিকতর ভাল বাসিত। মাজননীও সুষমা ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। সুষমাকে তিনি তাঁহার সমুদায় গুণগ্রামে দীক্ষিতা করিলেন। অতঃপর বিবাহের উপযোগিনী হইলে বসন্তকুমারী বহু অনুসন্ধানের পর যশোহর জেলার অন্তর্গত পাঁজিয়া নিবাসী খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র উকিল শ্রীমান্ বিজয়গোপাল বসুর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। শ্রীমান্ বিজয়ের কুলগৃহীতা পত্নীর কালপ্রাপ্তি হওয়ায় তিনি পুনরায় সুষমার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ কলিকাতায় বসন্তকুমারীও তাঁহার পতির তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়। বসন্তকুমারী সুষমাকে যেমন স্বীয় কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, নবজামাতা ও তাঁহাকে নিজের জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বসন্তকুমারী যখনই কলিকাতায় আসিতেন জামাতা ও কন্যা উভয়ে আসিয়া তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিত ও তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কলিকাতায় থাকিয়া আবার যশোহরে যাইত। সুষমার পত্র আসিতে বিলম্ব হইলে বসন্তকুমারীর চিন্তার আর অবধি থাকিত না। তাঁহার একরূপ অন্ন-জল ত্যাগ হইত। যেরূপেই হউক জামাতা ও কন্যার সুস্থতার খবর আনাইয়া তবে তিনি সুস্থ হইতেন। বসন্তকুমারীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে সুষমা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কন্যা ছিল। তাই তাহার জন্য এ জন্মেও তাঁর এত স্নেহ ও মমতা। অন্যান্য দেবরদের সন্তান সন্ততিদেরও তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং কলিকাতা হইতে যখনি বাটী আসিতেন তখনই দেবরপুত্র ও কন্যাগণের জন্য এমন কি অপরের সন্তানগণের জন্যও জামা, পুতুল ইত্যাদি কিছু না কিছু আনিতেন। আবার যখন তিনি রায়েরকাঠীতে থাকিতেন তখন ছেলেরা সকলেই জ্যেঠাইমার কাছেই থাকিত ও তাঁহাকে বড়মা বলিয়া ডাকিত। বস্তুতঃ স্বয়ং নিঃসন্তান হইলেও বসন্তকুমারী জননীর হৃদয় লইয়া ধরায় আসিয়াছিলেন, তাই বালক বালিকামাত্রই তাঁহার মাতৃস্নেহ লাভ করিত। তিনি অবসর পাইলেই বালক বালিকা-দের লইয়া থাকিতেই ভাল বাসিতেন। বসন্তকুমারী প্রায়ই বলিতেন আমার সন্তান না হইয়া ভালই হইয়াছে, আমার সন্তান হইলে আমি এত-গুলি সন্তানকে ভালবাসা ও স্নেহ দিতে পারিতাম না। যাঁহারা বলেন জননী না হইলে জননীর স্নেহ পরের সন্তানের উপর কথনও অর্পিত হইতে পারে না তাঁহারা বসন্তকুমারীর জীবনী পাঠে সে অন্ধ-বিশ্বাস হইতে নিরস্ত হইবেন। জানি না বসন্তকুমারী কি কারণে স্বয়ং নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তিনি যেরূপ ছেলেমেয়েদের প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেন সেরূপ প্রাণের ভালবাসা আজকাল কয়জন শিশু তাহাদের গর্ভধারিণীদের নিকটে পাইয়া থাকে তাহা বলা বড় কঠিন হইবে। গর্ভধারিণী হইলেই যে স্নেহের উৎস উৎসারিত হইবে তাহা সর্ব্বত্র সত্য নহে, হৃদয়ের প্রসারের অভাবে স্নেহ চিরদিনই সঙ্কীর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। শিক্ষা ও দীক্ষায়

যাঁহার হৃদয়ের কপাট উন্মোচিত হইয়াছে তিনি সন্তানবতী হউন আর নাই হউন বালক-বালিকামাত্রই তাঁহার নিজের সন্তান। তাঁহার হৃদয়ের অপার অনন্ত স্নেহপারাবার বালক-বালিকামাত্রেরই দর্শনে উদ্বেলিত হইবে।

নগেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার আত্মীয় ও বান্ধবগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে বংশরক্ষার জন্য পুনরায় দার-পরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করিতেন। কিন্তু পতি ও পত্নীর অভিন্ন-হৃদয় ও একপ্রাণতা যিনি একবার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তিনি কি আবার দারান্তরগ্রহণে ইচ্ছা করিতে পারেন? বসন্তকুমারীও যেমন পতিগত হৃদয় ও পতিগতপ্রাণ ছিলেন, নগেন্দ্রনারায়ণও তাহা হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহেন। তিনি সকলকে দারান্তরগ্রহণের অশেষ দোষ বুঝাইয়া দিয়া নিরস্ত করিতেন। বসন্তকুমারীও জানিতেন তাঁহার পতি জীবিতাবধি দারান্তর গ্রহণ করিবেন না, তাই তিনি কখনও স্বামীর নিকটে বিবাহের উল্লেখ করেন নাই।

বস্তুতঃ আমাদের দেশেই আর্য্য ঋষিগণ সর্ব্ব প্রথমে বিবাহের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে—"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা। ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য বলিয়া গিয়াছেন। কালে আর্য্যগণের অবনতির সঙ্গে সমাজে বহু বিবাহের সৃষ্টি হইলেও ঋষিগণ 'পত্নী' ও 'ভোগিনীর' পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অতঃপর আর্য্যদের সম্পূর্ণ পতনের সঙ্গে সঙ্গে পতি ও পত্নীর পূত, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়া ভোগ বিলাসের জন্য সমাজে পুরুষের নির্ব্বিচারে বহুপত্নীগ্রহণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজরাজত্বে আবার সকলে সংস্কৃত না জানিলেও ইংরাজদের উচ্চ আদর্শে সমাজ হইতে সেই কুৎসিত বহু বিবাহ প্রথা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। বিলাসী লোকদের মধ্যে নানা কারণে দারান্তর গ্রহণ প্রথা ছিল

বটে, কিন্তু পতিমাত্রেরই যে একজন পত্নী এবং আর সকলে তাহার ভোগ-সঙ্গিনী, ইহা প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই অভিমত।

১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বসন্তকুমারীর শ্বশ্রূমাতা শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী গঙ্গাবাসিনী হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিয়া মধ্যে মধ্যে তীর্থাদি পর্য্যটন মানসে নানা পুণ্যস্থানে যাইতেন। বসন্তকুমারী ও তাঁহার স্বামী কলিকাতায় আগমন করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু ১৩২৩ সাল হইতে অনেক দিন যাবৎ নানাবিধ সাংসারিক গোলযোগে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই কলিকাতায় আসিয়া জননীর সেবা করিতে পারেন নাই। ১৩২৪ সালের মাঘ মাসে একদিন কর্ত্তব্যময়ী বসন্তকুমারী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে স্বামীকে বলিলেন—"আপনাদিগের তিন ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে বৃদ্ধা মাতা একাকিনী রহিয়াছেন। আপনাদের অন্ততঃ একজনের তাঁহার নিকটে থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার শেষকাল শান্তিতে যাইতে দেওয়া উচিত। আমার মনে হইতেছে বড়ই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হইতেছে।" উহা শুনিয়া নগেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—"সকলই সত্য। একাকী আমি কি করিতে পারি? আমি এখানে না থাকিলে, আমার ও মাতার বিষয়-সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণ হয় না। আমাদের দেশের সম্পত্তির অবস্থা তোমার সকলই ত জানা আছে। নিজে না দেখিলে কিছুই থাকে না, মাকে মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাঠাইতেও পারি না। তবুও যখনই সময় করিয়া উঠিতে পারি তখনই যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করি। যাহা হউক, আমি স্থির করিলাম তুমি যাইয়া মার সেবা শুশ্রূষা কর। আমি আবার ৺পূজার পূর্ব্বে কলিকাতায় যাইয়া তোমাকে লইয়া আসিব।" বসন্তকুমারী বলিলেন—"আপনি রুগ্ন, সর্ব্বদা আপনার সেবার জন্য লোকের দরকার, তারপর আমার শরীরও ভাল নয়। এখন আপনারও আমার একস্থানে থাকাই কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্য পক্ষে মা

ও বৃদ্ধা, তাঁহার সেবা শুশ্রূষাও একান্ত কর্ত্তব্য।" বসন্তকুমারী তাঁহার শ্বশ্রূমাতাকে নিজের জননীর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিও পুত্রবধূকে নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। যাহা হউক এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর বসন্তকুমারীর যাওয়াই স্থির হইল। এই সময়ে বসন্ত-কুমারীর দ্বিতীয় ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের নিকট হইতে এক চিঠি আসিল যে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বীরেনের শুভ বিবাহ উপস্থিত। সেইজন্য বিনোদবাবু নগেন্দ্রনারায়ণও বসন্তকুমারীকে কলিকাতায় আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনারায়ণ বৈষয়িক কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে কিছুতেই যাইয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার অনুজ যতীন্দ্রনারায়ণ তাঁহার কন্যাকে শ্বশুরালয়ে দিয়া আসিতে যাইতেছিলেন, তাঁহারই সঙ্গে বসন্তকুমারীকে পাঠাইয়া দিলেন। বসন্ত-কুমারী দেবর ও দেবর কন্যার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া শ্বশ্রূমাতার শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। তৎপরে নগেন্দ্রনারায়ণের চিঠি অনুসারে বিনোদবাবু জগৎমোহিনীর অনুমতিগ্রহণ করিয়া ভগিনীকে পুত্রের বিবাহোপলক্ষে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন। ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে বসন্তকুমারী কলিকাতায় আসিলেন। হায়, এই যাত্রাই তাঁহার রায়ের কাঠী হইতে শেষ যাত্রা হইল।

বীরেনের বিবাহ নিরাপদে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বসন্তকুমারী আবার শ্বশ্রূমাতার চরণতলে প্রত্যাগতা হইলেন। জগৎমোহিনী তখন তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপুত্রদের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছিলেন। বসন্তকুমারী কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার সেবা, শুশ্রূষা ও কার্য্যগুণে বাটীস্থ সকলেরই চিত্ত হরণ করিলেন। সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা। জগৎ-মোহিনীও পুত্রবধূতে আবার মাতার স্নেহ, কন্যার শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং শুশ্রূষাকারিণীর অনুরাগপূর্ণ দক্ষতা পাইয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন।

১৩২৫ সালের আষাঢ় মাসে নগেন্দ্রনারায়ণ বসন্তকুমারীকে রায়ের-কাঠীতে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন, কেননা শারদীয়া পূজা সন্নিকট, বসন্তকুমারী বাড়ী থাকিলে পূজার আয়োজনের জন্য কাহারও কোন ভাবনা থাকে না; সর্ব্বোপরি পূজার সময়ে গৃহলক্ষ্মী গৃহে না থাকিলে গৃহ শূন্য জীর্ণারণ্যের ন্যায় দেখায়, এই সব বিবেচনা করিয়াই নগেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় যাইলেন।

ঠিক এই সময়ে নগেন্দ্রনারায়ণের মাতৃষ্বস্রেয় শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব মহাশয়ের গর্ভবতী কন্যা শ্রীমতী দুর্গাবতী প্রসবের জন্য পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। বসন্তকুমারী ও নগেন্দ্রনারায়ণ উভয়েই দুর্গাবতীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং দুর্গাবতীও জ্যেঠামহাশয় ও জ্যেঠাইমার নিতান্ত অনুগত ছিল। এক্ষণে জ্যেঠামহাশয় জ্যেঠাইমাকে লইয়া যাইবেন শুনিয়া দুর্গাবতী জ্যেঠামহাশয়ের পদধারণ করিয়া বলিল—"জ্যেঠামহাশয়, আমি লজ্জাত্যাগ করিয়া আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আশ্বিনমাসে আমি 'পস' হইব, আপনি কার্ত্তিকমাসে জ্যেঠাইমাকে লইয়া যাইবেন। জ্যেঠাইমা না থাকিলে আমার বড়ই কষ্ট হইবে।" নগেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে নানারূপ প্রবোধ দিলেন এবং বসন্তকুমারী পূজার সময়ে বাড়ী না গেলে যাহা কিছু অসুবিধা তৎসমুদায় বুঝাইলেন। কিন্তু দুর্গাবতী কিছুতেই জ্যেঠাইমাকে ছাড়িতে রাজি হইল না। নগেন্দ্রনারায়ণ তখন বসন্তকুমারীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। বসন্তকুমারী দুর্গাবতীকে নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত দয়াপ্রবণ ছিল। তিনি বলিলেন—"স্ত্রীলোকের এই সময়ের অপেক্ষা আর বিপদের সময় নাই। ইহার যখন নিতান্ত ইচ্ছা তখন আমাকে রাখিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। পূজার পরই আমাকে লইয়া যাইবেন। এবৎসর আমার অদৃষ্টে বাড়ীতে মার পূজা দেখা ঘটিবে না। পর বৎসর ঘটিবে কিনা তাই বা কে বলিতে পারে?" হায়, সাধ্বী পতিপ্রাণার বাক্য কার্য্যেও পরিণত হইল। কে

জানিত যে, কালকীট আয়ুর্বৃক্ষের মূল ক্রমশঃ কাটিয়া বৃক্ষটি ধ্বংস করিবার উপক্রম করিতেছিল? বসন্তকুমারী রায়েরকাঠীতে যাওয়া স্থগিত করিলেন বটে, কিন্তু বাড়ীর পূজা দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। নগেন্দ্রনারায়ণও দুর্গাবতীকে নিতান্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া তাহার সানুবন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি একাকী বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

৺শারদীয়া পূজার সময়ে মহাষ্টমীর দিন নগেন্দ্রনারায়ণদের বাড়ী হইতে মহিষ ও ছাগ ৺সিদ্ধেশ্বরী মাতার বাড়ীতে বলি হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রায়েরকাঠীর রায়চৌধুরী বংশ সিদ্ধেশ্বরী মাতার চির-রক্ষিত। রাজবাড়ীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে তন্ত্রোক্ত বিধান মত নরমুণ্ডে নির্ম্মিত বেদীর উপরে মাতা সিদ্ধেশ্বরীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। ৺শারদীয়া পূজার সময়ে রাজবাড়ী হইতে প্রত্যহ পালাক্রমে মহিষ ও ছাগ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে বলি হইয়া থাকে। রায়েরকাঠীর রায়চৌধুরী বংশ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। মহাষ্টমীর দিন নগেন্দ্র-নারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের পালা। এ বৎসরও মহিষ ও ছাগ যথানিয়মে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে প্রেরিত হইল এবং কর্ত্তারা পারিষদবর্গ ও শত শত লোকে পরিবৃত হইয়া দেবীর পূজা ও বলি দর্শনের জন্য গমন করিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন কোনও বৎসর যাইতে পারিতেন, কোনও বৎসর পারিতেন না। এ বৎসরও যাইতে পারিলেন না। পূজা ও বলি সমাপনান্তে যখন শোভাযাত্রিকগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন নগেন্দ্রনারায়ণ কাহারও কাহারও মুখে শুনিলেন যে 'মহিষ বাধিয়া গিয়াছে' অর্থাৎ খড়্গের এক আঘাতে মহিষের মুণ্ড ছিন্ন হয় নাই। তিনি শুনিবামাত্র বড়ই শঙ্কিত হইয়া তাঁহার অগ্রজ গিরীন্দ্র-নারায়ণ ও পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "না, মহিষত বাধে নাই, মিথ্যাকথা।" কিন্তু নগেন্দ্রনারায়ণের মন তাহা বুঝিল

না। তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। এ বৎসরটি তাঁহার বড়ই ক্ষতির বৎসর। কলিকাতায় শ্যামবাজারের পোষ্টাফিসে তাঁহার নিজের সোনার চশমা অপহৃত হইয়াছিল। উহার দুই তিন দিন পরে তাঁহার একটি মূল্যবান সিল্কের ছাতি হারাইয়া যায়। বাড়ী প্রত্যাগত হইয়া দেখেন একখানি মূল্যবান রামপুরী চাদর ইন্দুরে কাটিয়া নিতান্ত অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল। এই সব সূচনায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি নগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সময় যে সে বৎসর নিতান্ত খারাপ পড়িয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে ছিলেন এবং তাঁহার পত্নীকে ও অপর অনেককেই ইহা বলিয়াছিলেন। বিশেষতঃ স্বুবর্ণচুরি ও মহিষবাধা নিতান্ত অমঙ্গলের পূর্ব্ব সূচনা। নগেন্দ্রনারায়ণ বংশরক্ষয়িত্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতার নিকটে নানারূপ অপরাধ স্বীকার করিয়া বৎসরটি যাহাতে নিরাপদে যায় তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং বাড়ীতে যে লক্ষ্মী জনার্দ্দন শালগ্রাম বিগ্রহ আছেন তাঁহার কাছে পূর্ব্ব হইতেই পুরোহিত দ্বারা প্রত্যহ একটি করিয়া তুলসী দেওয়াইতেছিলেন। শারদীয়া পূজা সমাপিত হইল। বিজয়ার দিন শুনিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনারায়ণ পীড়িত। সুরেন্দ্রনারায়ণ তখন পৃথক্-অন্ন হইয়া বাগানে নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ ভ্রাতাকে দেখিতে গিয়া বুঝিলেন তাঁহার অসুখ গুরুতর, জীবন সংশয়। নগেন্দ্র-নারায়ণ সেই দিন হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ভ্রাতাকে কালের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। সুরেন্দ্রনারায়ণ অকালে মহা-নিদ্রায় শায়িত হইলেন। পূর্ব্ব সূচনার ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। নগেন্দ্র-নারায়ণ শোকে যেমন মুহ্যমান হইলেন, তেমনি মহাবিপদের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তবে তিনি প্রখর বুদ্ধিমান্ ও ভগবানে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। তাই ক্রমে ক্রমে শোক দমন করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইলেন। ধীরে ধীরে সমুদয় গোলযোগ বিদূরিত করিয়া কলিকাতায় গেলেন। এই

কারণে ২৪শে অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় যাইতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন কলিকাতা যাইয়া একটু সুস্থ হইয়া পত্নীকে লইয়া বাটী আসিবেন। একে নিজে রুগ্ন ও চিত্তে দারুণ শোক, তারপর নানারূপ বৈষয়িক গোলযোগ। নগেন্দ্রনারায়ণ নিতান্ত কাতর হইয়াই কলিকাতায় চলিলেন। মনে করিলেন মানসিক বেদনার ভাগ পত্নীকে দিলে অনেকটা সুস্থ হইতে পারিবেন। বসন্তকুমারীও পতির অনুরূপ পত্নী ছিলেন। তিনি অতুলনীয় প্রেমে, অলৌকিক সহানুভূতিতে ও সর্ব্বোপরি প্রাণঢালা সেবায় রুগ্ন ও শোকসন্তপ্ত স্বামীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন, তাঁহার বিষণ্ণ, শুষ্কপ্রায় বদনে আবার হাসি ফুটাইলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

জীবনের শেষ অধ্যায়।

বিশ্বনিয়ন্তার এই বিশ্ব সৃষ্টি-রহস্য বড়ই নিগূঢ়। মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞান যতই সম্পূর্ণতা লাভ করুক না কেন, সৃষ্টি ও লয়-তত্ত্ব চিরদিনই তাঁহার নিকটে দারুণ কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন থাকিবে। ঊর্ণনাভের জালের সূত্রগুলি তুমি খুলিয়া কার্য্যকর করিতে সাহস করিতে পার, কিন্তু সৃষ্টি ও লয়ের জটিলতা ভেদ কখনও করিতে পারিবে না। অথচ লীলাময়ের রাজ্যে কিছুই বিনা নিয়মে সঙ্ঘটিত হয় না। প্রতি বস্তুর উৎপত্তি ও লয়ের মধ্যে আমরা এক অবিচ্ছেদ্য নিয়ম বর্ত্তমান দেখিতে পাই। যেমন

প্রকাশ্য নিয়মগুলি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, সেইরূপ আকস্মিক নিয়মগুলিও সর্ব্বত্র অটুট। কারণ ব্যতীত কোথায়ও কোনও কার্য্য হয় না। কিন্তু সর্ব্বত্র সেই কারণনির্দ্দেশ আমাদের সসীম জ্ঞানের লক্ষ্যাতীত। অনেক সময়েই আমাদিগের কার্য্য দেখিয়া কারণনির্ণয় করিতে হয়। তখন উহাতে আর কিছুই ফল হয় না। কুলপতি মহর্ষিকণ্বকে প্রণতি জানাইতে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে না হইতে দক্ষিণ বাহুর পুনঃপুনঃ স্পন্দনে যখন বিচক্ষণ বহুদর্শী নৃপতি দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তখন সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট আমাদের আর কথা কি? বিধাতার পুত্র স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষিও রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশবৎসরব্যাপী বনবাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারেন নাই। মহামায়া আমাদিগকে এমনই তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! দুইদিন পরে যে ঘটনা ঘটিবে বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ নিয়মে উহার কারণগুলি পূর্ব্ব হইতেই ঘটিতে থাকে, এবং একটু প্রণিধান করিলে আমরা যে কিছু কিছু লক্ষ্য করিতে না পারি তাহাও নহে, তবে মহামায়াডোরে বদ্ধ থাকায় আমরা সাধারণতঃ এমন সময়ে উহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হই যে তখন আর তাহার প্রতিবিধানের উপায় থাকে না।

নগেন্দ্রনারায়ণের কলিকাতায় যাইবার কিছুদিন পরে একদিন তাঁহার মাসতুত ভাইঝী দুর্গাবতী হাসিতে হাসিতে বলিল—"জ্যেঠামশায়, শুনিয়াছেন যে জ্যেঠাইমা এবার স্বর্গে যাবেন? জ্যেঠাইমা একদিন আহ্নিকের পর প্রণাম করিয়া যখন মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন তিনি যেন দৈববাণীতে শুনিতে পাইলেন 'তোমার মনস্কামনা সত্বরই পূর্ণ হইবে, বেশী বিলম্ব নাই।' জ্যেঠাইমা প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদির পর মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করেন—মা, আমার স্বামীকে রাখিয়া আমি যেন আগে তোমার চরণে লীন হইতে পারি। মা, বৈধব্য-যন্ত্রণা যেন কখনও ভুগিতে না হয়। সম্প্রতি আমাদের বাড়ীর নিকটে শারদা

বাবুর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীর বৈধব্যাবস্থার আর্ত্তনাদ শুনিয়া জ্যেঠাইমা আরও ভয় পাইয়া একান্ত মনে মা কালীকে জানাইতেন। তারই ফলে এই দৈববাণী পাইয়াছেন। জ্যেঠাইমা কথায় কথায় মা ও আমাকে এই কথা বলিলেন। তা জ্যেঠামশায়, একি কখনও হয়? জ্যেঠাইমার এ এক অদ্ভুত কথা।" নগেন্দ্রনারায়ণ কিছুই বলিলেন না; কেন না তিনি জানিতেন যে বসন্তকুমারী তাহাকে রুগ্ন দেখিয়া বাড়ীতে প্রত্যহ মাতা সিদ্ধেশ্বরীর নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন এবং বলিতেন 'দেখিবেন আমি নিশ্চয়ই আপনার পূর্ব্বে যাইব'।

কিয়ৎকাল পরে নগেন্দ্রনারায়ণ চিত্ত দমন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তারপর মা, তোমরা কি বলিলে?'

দুর্গাবতী। 'আমরা বলিলাম, জ্যেঠাইমা, আমাদেরও লইয়া যাইবেন। আপনি কখনও একা যাইতে পারিবেন না।'

সেখানে তখন বসন্তকুমারীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীর মুখের চেহারা দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিয়া ফেলিলেন। অমনি সাধ্বী নানাকথায় উহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে একটি দিব্য হাসি বিরাজিত ছিল, তাহা দেখিয়াই তীক্ষ্ণবুদ্ধি নগেন্দ্রনারায়ণ বুঝিলেন যে কেবল তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্যই বসন্তকুমারী দৈব ইঙ্গিতটীকে অমূলক বলিতেছেন। যাহা হউক এ সম্বন্ধে পতি ও পত্নীমধ্যে আর কোনও আলোচনা হইল না। পতিপ্রাণা পতির মনঃকষ্ট দূর করিবার জন্যই এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা তাহাকে বলেন নাই।

নগেন্দ্রনারায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্রী সুষমাকে এই সঙ্গে রায়েরকাঠীতে লইয়া যাইবার জন্য বৈবাহিক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণবসু ও জামাতা শ্রীমান্ বিজয়কে পত্র লিখিলেন। অম্বিকাবাবু মত করিলেও জামাতার অভিমত করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে পৌষমাসের ১৫ দিন

কাটিয়া গেল। ঐ সময়ে বসন্তকুমারী একদিন বলিলেন যে যখন জামাতার মত হইয়াছে তখন পৌষ মাসের বাকী কয়েকটা দিন থাকিয়া মাঘ মাসের প্রথমেই সুষমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া ভাল। নগেন্দ্রনারায়ণও তাহাতে অমত করিলেন না, কারণ সুষমার বিবাহের পর হইতে আর তাহার রায়েরকাঠীতে যাওয়া ঘটে নাই।

দৈবলিপি অখণ্ডনীয়। 'লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ?' পৌষ মাসের অল্প কয়েকদিন থাকিতে থাকিতে ঐবাড়ীতে নগেন্দ্রনারায়ণের মাসতুত ভাই নিত্যেন্দ্রের ইনফ্লুএনজা হইয়া ডবল নিমোনিয়া হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে চুনীলাল বাবুর জামাতা, পত্নী, দৌহিত্র, প্রভৃতি সকলেরই এক সঙ্গে ইনফ্লুএনজা জ্বর হইল। তখন কলিকাতায় ইনফ্লুএনজা অথবা ওয়ার ফিবারের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ঐ রোগে প্রত্যহ বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। নগেন্দ্রনারায়ণ বাটীস্থ সকলের পীড়ায় নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ঐ পীড়াটি নিতান্ত স্পর্শসংক্রামক জানিয়া নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীন্দ্রকে তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাসা-বাটীতে স্থানান্তরিত করিলেন এবং পত্নী বসন্তকুমারীকেও তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি তোমার পিত্রালয়ে দিন কয়েকের জন্য যাও। পীড়াটি বড়ই স্পর্শসংক্রামক। আমি থাকিয়া ইহাদের সেবা শুশ্রূষা করিব।" সাধ্বী প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"আপনি কি বলিতে-ছেন! পীড়া যদি স্পর্শসংক্রামক হয় তাহা হইলে আপনাকে উহার মধ্যে রাখিয়া আমি নিরাপদ স্থানে যাইব? আপনিই বলিয়া থাকেন, বিপদের কালে পরকে পর্য্যন্ত পরের ফেলিয়া যাওয়া উচিত নয়, তখন ইহারা আমাদের নিতান্ত আত্মীয়, ইহাদের ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাইতে পারি? আপনি আমাকে দয়া করিয়া এখানে রাখুন আমিও আপনার

সঙ্গে ইহাদের সেবা শুশ্রূষা করিব। আমি চলিয়া গেলে ইহাদিগকে কে পথ্য দিবে? আপনি আমাকে এখানে থাকিতে অনুমতি করুন। আমি অন্য কোথাও গিয়া সুস্থ থাকিব না।"

নগেন্দ্রনারায়ণ পত্নীর অনুরোধের গুরুত্ব বুঝিয়া অন্তরে প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে সেখানে থাকিয়া রমণীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপালনে অনুমতি প্রদান করিলেন। পতির অন্তরের অনুমতি পাইয়া পতিব্রতা জননীর ন্যায় গৃহস্থিত রোগীদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। ইনফ্লুএন্জা স্পর্শসংক্রামক পীড়া বলিয়া তিনি রোগীদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া পথ্যাদি দিতেন না। রোগীদের কাছে বসিয়া গায় হাত বুলাইয়া দেওয়া, মাথায় বাতাস করা, বিছানার চাদর প্রভৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া, কোন কার্য্যেই বসন্তকুমারী পরাঙ্মুখী ছিলেন না।

এইরূপে তিনি বাটীস্থ প্রায় সকলকেই স্বীয় অসাধারণ শ্রমশীলতা ও সেবাগুণে সুস্থ করিয়া ১লা মাঘ নিজে ঐ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। উহার দুই দিন পরে নগেন্দ্রনারায়ণও পীড়িত হইয়া পড়িলেন। নগেন্দ্র-নারায়ণ স্বভাবতঃ রুগ্ন, সুতরাং ইনফ্লুএঞ্জাও তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসিল। জ্বর হইতে না হইতেই তাহার নিমোনিয়া দেখা দিল। বসন্তকুমারী বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পতিব্রতা নিজের পীড়া ভুলিয়া গিয়া স্বামীর সেবায় নিরত হইলেন। এমন কি স্বামীর পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার মলমূত্র ত্যাগের সাহায্য করিতেন, চিররুগ্ন স্বামীর সেবা অন্যের দ্বারা ঠিক হইবে না তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি যতক্ষণ সজ্ঞানে ছিলেন স্বামীর শুশ্রূষা নিজ হস্তে করিয়াছিলেন।

বসন্তকুমারীর জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া টাইফয়েড জ্বরে পরিণত হইল। নগেন্দ্রনারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার পরম আত্মীয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বারা টেলিফোনে তাঁহার সম্বন্ধী ভবানীপুরের

সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয়কে তাঁহাদের উপস্থিত পীড়ার কথা জানাইলেন। শ্যামবাজারের খ্যাত নামা এসিষ্ট্যাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম হইতেই বসন্তকুমারীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। বিনোদবাবু আসিয়া রোগ ও প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে যেরূপ চিকিৎসা হইতেছে এই ব্যাধির পক্ষে উহাই সুচিকিৎসা। সুতরাং চিকিৎসার কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। তখনও বসন্তকুমারীর বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি বিনোদ বাবুকে বলিলেন—"দাদা, আমাকে না দেখিয়া আপনার ভগিনীপতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হ'ন। তাঁহার পীড়া আমার অপেক্ষা গুরুতর—আমি বড়ই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি।" উহার পরদিন তিনি নগেন্দ্র নারায়ণকে বলিলেন—"আমার জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। বহু চেষ্টায় মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। এ যাত্রা আর উদ্ধার নাই; এ জীবনে আমি আপনার অনিচ্ছায় কখনও কোন কাজ করি নাই, কিংবা আপনাকে না জানাইয়া কোন খরচ করি নাই। আমি কিছুই লইয়া যাইব না। সকলই ঐ বাক্‌সের ভিতরে রহিল। এ যাত্রার মত আসি তবে—আবার সাক্ষাৎ হইবে।" ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার জ্ঞান লোপ হইয়া গেল। নগেন্দ্রনারায়ণ পত্নীর নিকটে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিলেন, তাঁহার নিজের পীড়া প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ভাবিলেন, "এক্ষণে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে কেন? সাধ্বীর সমুদয় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। সুষমা ও জামাতাকে দেখিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বার বার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুষমা ও তাহার কন্যা প্রভৃতির জ্বর, বিশেষতঃ সুষমা গর্ভবতী, এই সব কারণে সুষমার কখনই দারুণ সংক্রামক পীড়ার মধ্যে আসা উচিত নয়, তবে জামাতার আসা উচিত।" এইরূপ স্থির করিয়া জামাতাকে সমুদায় পীড়ার কথা জানাইয়া পত্রপাঠ আসিবার জন্য চিঠি পাঠাইলেন।

বসন্তকুমারী স্বভাবতঃ বড়ই লজ্জাশীলা ছিলেন। তাঁহার বিবাহের পর যাহাদের জন্ম হইয়াছে তাহাদিগেরও বয়ঃপ্রাপ্তির পর নিকটে দেখিলে তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া দিতেন। তিনি বড় দেবরদিগের সঙ্গে কথা বলিতেন না। তাহারা নিকটে আসিলে মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিতেন। কিন্তু ঘোর বিকারের আক্রমণে আর তাহার মাথায় কাপড় রহিল না। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় চারিদিকে চাহিতে ছিলেন। ঐ সময়ে বৈবাহিক অম্বিকাবাবু নগেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার স্ত্রীর পীড়ার খবর পাইয়া দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি এই বাটীতে কতবার আসিয়াছি, সময় সময় ৫। ৭ দিনও রহিয়াছি, কিন্তু কখনও বৈবাহিকার মুখ দেখি নাই, বা তাঁহার গলা শুনি নাই। আজ যখন তিনি আমাদের সম্মুখে মুখের কাপড় ফেলিয়া রহিয়াছেন, তখন নিশ্চয় ঘোর বিকার, বড়ই চিন্তার কারণ হইয়াছে।" তিনি বাটী যাইয়াই পুত্র বিজয়কে পাঠাইয়া দিলেন। জামাতা এখানে যখন আসিয়া পঁহুছিলেন তখন বসন্তকুমারী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্যা। 'বিজয় আসিয়াছে, জামাতা আসিয়াছে', এরূপ পুনঃ পুনঃ বলায় একবার 'হাঁ' বলিলেন বটে, কিন্তু চিনিতে পারিলেন কিনা জানি না।

নগেন্দ্রবাবু মেডিকেল কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল সুপ্রসিদ্ধ কালভার্ট সাহেবকেও আনাইয়াছিলেন। সাহেবও রোগীকে পরীক্ষা করিয়া প্রমথ বাবুর ব্যবস্থা বহাল রাখিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্য রতন চক্রবর্ত্তী এম, বি মহাশয় তাঁহার ব্যাক্‌টোরিয় লজিক্যাল লেবরেটরিতে রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিও প্রমথ বাবুর মত বহাল রাখিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ তখন কক্ষান্তরে রুগ্ন শয্যায় শায়িত, একরূপ উত্থান শক্তি রহিত, যাতায়াত দ্বারাও স্ত্রীর তত্ত্বাবধারণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তথাপি বসন্তকুমারী কখন কিরূপ থাকেন তাহা ডাক্তার মহাশয় কিংবা অন্য কাহারও নিকটে সর্ব্বদাই তত্ত্ব লইতেন। প্রমথবাবু তখন নগেন্দ্র বাবুকেও চিকিৎসা

করিতেন। নগেন্দ্রনারায়ণের জ্বর যখন একটু কম থাকিত তখনই তিনি বারান্দার রেল ধরিয়া কষ্টে স্বষ্টে বসন্তকুমারীর কক্ষে গিয়া তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিতেন ও নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া একেবারে চমকিত হইয়া যাইতেন। নগেন্দ্রনারায়ণ নিজে একজন বিচক্ষণ নাড়ীজ্ঞ। ইতিমধ্যে নগেন্দ্রনারায়ণের নিজের অসুখও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার আর উঠিবার শক্তি একেবারে রহিল না। তখন জামাতা শ্রীমান বিজয় ও চুনীলাল বাবুর জামাতা শ্রীমান্ হরিচরণ প্রভৃতির * মুখে 'কেবল এক রকমই আছেন' এই তত্ত্ব লইয়াই তাহাকে নিরন্ত থাকিতে হইত। প্রমথ বাবুও একদিন তাহাকে বলিলেন 'নগেন বাবু, আপনার স্ত্রী এযাত্রা রক্ষা পাইলেন।' প্রমথ বাবুর কথায় নগেন্দ্রনারায়ণ যেন মহাসাগরের কূল পাইলেন, কেননা তিনি প্রমথ বাবুকে একজন সুচিকিৎসক বলিয়া জানিতেন।

এইরূপে ক্রমে দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল। বসন্তকুমারী ৺চন্দ্রনাথ ও ৺ কাশীধামে যখন গিয়াছিলেন তখন বাবা চন্দ্রনাথকে বেদানা ও বাবা বিশ্বনাথকে কমলা লেবু দিয়াছিলেন। তাই তিনি রোগের সময়ে ডাক্তার ও আত্মীয়দের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কমলা ও বেদানা গ্রহণ করিতেন না, বলিতেন নশ্বর দেহের জন্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে আপনারা কখন অনুরোধ করিবেন না। নগেন্দ্রনারায়ণ পত্নীর ধর্ম্মনিষ্ঠা জানিতেন, তাই তিনি আঙ্গুর আনাইয়া দিতেন, তাহাই তিনি খাইতেন। পশ্চাৎ জ্ঞান লোপ হইবার পর অবশ্য ডাক্তারদের ব্যবস্থা মত বেদানার রস ও কমলালেবুর রস খাওয়ান হইয়াছিল। এই পীড়ায় ঘোর বিকারে অজ্ঞান অবস্থায়ও বসন্তকুমারী আশ্চর্য্য পতিভক্তির পরিচয়

* মাতা, মাসিমাতাগণ জামাতা বিজয় গোপাল এবং মাসতুত ভ্রাতৃবধূ ও মাসতুত ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ অনেকেই খুব শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

প্রদান করিয়াছিলেন। বিকারের ঘোরে তিনি যখন অজ্ঞান ছিলেন তখন বায়ুর প্রকোপে সময় সময় উঠিয়া বসিতেন। সেই সময়ে কিছুতেই শুইতে চাহিতেন না, কিন্তু যেই তাঁহার কর্ণে 'নগেন্দ্রনারায়ণ শুইতে বলিতেছেন,' এইকথা প্রবিষ্ট হইত অমনি শুইয়া পড়িতেন। সেইরূপ ঔষধ খাইতে না চাহিলে 'নগেন্দ্রনারায়ণ ঔষধ খাইতে বলিতেছেন' কাণে গেলেই অমনি হা করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিতেন। এই প্রকারে দেখিতে দেখিতে সতর দিন অতীত হইল। পরিশেষে কালরাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দিন রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। শুশ্রূষাকারিগণ ডাক্তার মহাশয়কে জানাইলেন, তিনি আসিয়া ইন্‌জেক্‌সন ইত্যাদি দ্বারা কোন মতে রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে শুশ্রূষাকারিগণ একটি বিষম ভুল করিলেন যে রোগীর আসন্নকাল জানিয়াও তাহার পার্শ্ব কক্ষস্থিত নগেন্দ্রনারায়ণকে কিছুই জানাইলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন যে তখন নগেন্দ্রনারায়ণের শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাকে জানাইলে একের সঙ্গে দুইই অরক্ষণীয় হইবেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিলেন না যে নগেন্দ্রনারায়ণ তখন জানিতে পারিলে বিচক্ষণ কবিরাজ আনাইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিতে পারিতেন এবং ক্ষোভ মিটাইয়া একবার জন্মের মতন দেখিতে পারিলে তাঁহার মনে আর কোন দুঃখ থাকিত না। বিধাতার বিধান অমোঘ, মানুষ তাহার প্রতিকূলে কিছুই করিতে পারে না বটে, তথাপি প্রতিকারের বিধানগুলির অনুষ্ঠানের সুযোগ পাইলে তাহার অনেকটা ক্ষোভ বিদূরিত হয়।

রাত্রি প্রভাত হইল—রোগী মুমূর্ষু। নগেন্দ্রনারায়ণ তখন পর্য্যন্ত উহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রবসু ও ডাক্তার প্রমথনাথ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রমথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কেমন আছেন?"

নগেন্দ্রনারায়ণ কাশিতে কাশিতে কষ্টে স্বষ্টে বলিলেন—"রাত্রে কাশির

উদ্বেগ বড়ই বাড়িয়াছিল, এক্ষণে জ্বরের তাপ ১০২.৫ ডিগ্রি। ওঘরে কেমন দেখিলেন ?"

প্রমথ বাবু। "এক প্রকার নয়, রাত্রেই কিছু বাড়িয়াছে।"

উত্তরটিতে একটু গোলযোগ দেখিয়া প্রবোধবাবু বলিলেন—"ডাক্তার বাবু, গোলমেলে উত্তরের দরকার কি ? দাদা, বৌদিদির অবস্থা ভাল নহে, আর বুঝি রক্ষা পাইল না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ইন্‌জেক্‌ট করিয়াছি, যদি নাড়ী আবার ফিরিয়া আসে, দেহ গরম হয়, তবে রক্ষা, নতুবা আশা নাই।"

শুনিবামাত্র নগেন্দ্রনারায়ণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি প্রত্যহ শুনিয়া আসিতেছিলেন তাঁহার স্ত্রী ক্রমশঃ একটু ভালর দিকে যাইতেছে, আর হঠাৎ আজ কি শুনিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন একেবারে অবশ হইয়া গেল, মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে নৈরাশ্য হইতে সাহস সঞ্চয় করিয়া একেবারে উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রোগীর ঘরে আসিলেন ও নিখিলবাবুকে হোমিওপ্যাথিক সুচিকিৎসক ডাক্তার সুশীলকুমার নাগ, এম, ডি মহাশয়কে আনিতে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে তাঁহার খুড়্‌তত ভাই সিটিকলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও তাঁহার অন্যতম খুড়্‌তত ভাই শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকেও যেন সে খবর দিয়া আসে। কিছুক্ষণ পরে নিখিলবাবু আসিয়া বলিলেন ডাক্তার নাগকে পাওয়া গেল না, উপেনবাবু প্রভৃতিকে খবর দিয়া আসিয়াছি, শুনিয়া নগেনবাবু হতাশ হইলেন, পুনরায় তাঁহাকে তাহাদের পুরোহিত ৺ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত স্ফুটবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আনিবার জন্য পাঠাইলেন।

নগেন্দ্রনারায়ণ এক্ষণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তিনি যেন অপার্থিব মানসিক ও শারীরিক শক্তি পাইলেন। তিনি

পত্নীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আর আশা নাই, সব চেষ্টাই বৃথা। তখন বলিলেন—"আমার স্ত্রী হিন্দুধর্ম্মপরায়ণা, সর্ব্ববিধ হিন্দু আচার ও নিয়মপদ্ধতি আজীবন পালন করিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিই তাঁহার অতি প্রিয়। পীড়ার সময়ে ডাক্তারগণ তাঁহাকে ব্রাণ্ডী ও ঔষধ সেবন করাইয়াছেন। সুতরাং ইঁহার এক্ষণে জীবন থাকিতে একটী চান্দ্রায়ণ নিতান্ত আবশ্যক।" এই সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"আপনার স্বর্গীয় পিতা বিবাহের মন্ত্র পড়াইয়াছিলেন, * এক্ষণে শেষ সময়ে আপনি চান্দ্রায়ণ করান—" আর বলিতে পারিলেন না। অশ্রুবেগে তাঁহার বাক্যরোধ হইয়া গেল।

ভট্টাচার্য্যমহাশয় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—"চান্দ্রায়ণের জন্য মার অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। অনুমতি গ্রহণ করুন।"

নগেন্দ্রনারায়ণ কথঞ্চিৎ সংযত হইয়া বলিলেন,—"রোগী কয়েকদিন-যাবৎ অজ্ঞান, কি করিয়া অনুমতি পাইব?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"আমি জানি মা আমার বড় ধর্ম্মপরায়ণা, দেবতা ও দ্বিজে মার একান্ত ভক্তি। তিনি কখনও অজ্ঞানে দেহত্যাগ করিবেন না। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনি জিজ্ঞাসা করুন, অবশ্য অনুমতি পাইবেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় নগেন্দ্রনারায়ণ রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল, তোমার চান্দ্রায়ণ করাইব?"

উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে শুনিলেন বসন্তকুমারী বলিলেন,—"করুন।"

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"ধর্ম্মপরায়ণার কার্য্য দেখিলেন

---

* নগেন্দ্রনারায়ণের স্বীয় পুরোহিত নাবালক ছিলেন বলিয়া উক্ত ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই তাঁহার বিবাহকালে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

ত? ইঁহারা স্বীয় পুণ্যের বলে পতিকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়েন।"

এই সময়ে উপেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিখিলেন্দ্র বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যবস্থানুযায়ী চান্দ্রায়ণের সমুদায় জিনিষ আনয়ন করিলেন। উপেন্দ্রনাথ বসন্তকুমারীর প্রতিনিধিরূপে চান্দ্রায়ণ করিলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে বসন্তকুমারীকে ঔষধও পথ্য খাওয়াইতে বড়ই কষ্ট পাইতে হইতেছিল, এমন কি তিনি সহজে জলটুকু পর্য্যন্ত খাইতেন না। আজ আর তাঁহার সে ভাব নাই। ঔষধ বলিলে খান না বটে, কিন্তু গঙ্গাজল কিংবা স্বামীর পাদোদক বলিয়া দিলে হাঁ করিয়া তখনই খাইয়া ফেলেন। রোগীর দেহে এক নব দিব্য জ্যোতিঃ দেখা গেল।

নগেন্দ্রনারায়ণের এক মাস্‌তুত ভ্রাতা নরেন্দ্রবাবু তাঁহার এই বিপদের সংবাদ পাইয়া তখনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রোগীর আসন্ন-কাল দর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া অক্‌সিজেন গ্যাস আনিবার জন্য ডাক্তার মহাশয়ের অভিমত জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। ডাক্তার মহাশয় বলিলেন,—"নরেনবাবু, আর অক্‌সিজেন গ্যাসে কি হইবে? আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, রোগী এখন মানুষের সমুদায় চেষ্টার বাহিরে। তবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এই ঔষধটা নিয়ে খাওয়াইয়া দেখুন।"

নরেন্দ্রবাবু ঔষধ লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। তৎপরে গ্যাসের জন্য বাহির হইলেন।

এদিকে নরেনবাবু যেই গ্যাস আনিতে নীচের তলায় নামিয়া আসিলেন অমনি পতিপরায়ণা সমীপোবিষ্ট পতির পানে চাহিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ বুঝিলেন—এই শেষ দৃষ্টি। তিনি প্রিয়তমার বক্ষে হস্ত প্রদান করিলেন ও দেখিলেন প্রাণপাখী উড়িয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রবাবুকে যাইতে নিষেধ করা হইল।

এইরূপে পতিব্রতা পতি, শ্বশ্রূমাতা ও আত্মীয়গণের সমক্ষে তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে করিতে মহাপ্রস্থান করিলেন। ১৩২৫ সালের ১৮ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা ১০ মিনিটের সময় নগেন্দ্রনারায়ণের চিরোজ্জ্বল দিব্য-বিভাময় পবিত্রকীর্ত্তি গৃহ-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। এক মুহূর্ত্তে তিনি গৃহিনী, সচিব, সখী, সহধর্ম্মিণী হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলেন। নগেন্দ্র-নারায়ণের বড় সাধের সাজান বাগান সহসা বাজ পড়িয়া পুড়িয়া গেল, ধন-রত্নপূর্ণ তরী কূলে আসিয়া ডুবিয়া গেল।

নগেন্দ্রনারায়ণ শোকে মূর্চ্ছিত প্রায়, তাঁহার জননী ও মাসীমাতাগণও তনয়ার তুল্য পুত্রবধূর শোকে অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মাস্‌তুত ভ্রাতৃবধূ এবং উপস্থিত আত্মীয়গণ শোকে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল শোকোচ্ছ্বাস গত হইলে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, —"ধন্য বধূমাতা! ধন্য তোমার পতিভক্তি! এমন রুগ্ন, প্রতিনিয়ত মুমূর্ষু পতিদেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে নশ্বর ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া অক্ষয় অবিনশ্বর দিব্যধামে চলিয়া যাইতে পারিলে! মা, তুমি আমাদের আদর্শ গৃহলক্ষ্মী!"

পল্লীস্থ সধবারা ভাগ্যবতীর ললাটে সিন্দূর লেপন করিতে করিতে নিজেদের জন্য তাদৃশ মৃত্যুর কামনা করিতে লাগিলেন ও সেই সিন্দুর নিজেদের কপালে লেপন করিলেন। শ্যামপুকুরের শিবশঙ্কর মল্লিক লেন নিবাসী সাধুচরিত্র শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মল্লিক মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও তখন গৃহাশ্রমে ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রনারায়ণকে ও তাঁহার স্ত্রীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং ঐ ব্যারামের সময় প্রত্যহ দুইবেলা তাঁহাদের উভয়কে দেখিতে আসিতেন। তিনি অনেকগুলি ফুলের মালা ও তোড়া আনিয়া মুক্তাত্মার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং শ্মশান-শয্যা, ফুলে ও ফুলের তোড়ায় সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। চুনীলালবাবুর স্ত্রী রামনাম ও হরিনাম সতীর কপালে ও বুকে লিখিয়া দিলেন এবং ভাগ্যবতীর দেহখানি

চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দিলেন। চুনীলালবাবুর জামাতা হরিচরণবাবু ফটোগ্রাফার আনাইয়া সাধ্বীর ফটো তোলাইলেন।

পুণ্যবতী অন্তকালে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া হাস্যমুখে স্বামীর চরণে যে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন প্রাণত্যাগের পর ঐ ভাবটি যেন ফুটিয়া উঠিয়া এক অপূর্ব্ব অপার্থিব রমণীয় দৃশ্য প্রকটিত করিতেছিল। উপেন্দ্র-নাথ, দেবেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ, মাস্‌তুত ভ্রাতা চুনীবাবু ও নিখিলবাবু, জামাতা হরিচরণবাবু ও অনাথবাবু, রঞ্জনচৌধুরী এবং কলিকাতার আত্মীয়গণ ও রায়ের কাঠীর বসন্তবাবুর পুত্র গঙ্গাচরণমিত্র প্রভৃতি হরিধ্বনি করিতে করিতে শব লইয়া শ্মশানে গমন করিলেন। পথে সিকি, দুয়ানি ও লাজ বর্ষণ করিতে করিতে শবসজ্জা অগ্রসর হইল। ৺কাশী মিত্রের ঘাটে ভাগ্যবতীর দেহ লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে শত শত স্নানার্থী আসিয়া মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া মুক্তাত্মার উদ্দেশে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ চিতাপিণ্ডের ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দ্বারা পিণ্ডদান মন্ত্র পাঠ করাইয়া নগেন্দ্রনারায়ণ পিণ্ডদান করিলেন এবং মুখাগ্নি করিলেন। প্রভূত ঘৃত, গুগ্‌গুল ও চন্দনে দাহকার্য্য আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে শব ভস্মাবশেষ হইল—নগেন্দ্র নারায়ণের বিভাময় গৃহ চির অন্ধকারপূর্ণ হইল। গঙ্গাজল দ্বারা চিতাচুল্লী ধৌত করিয়া দেহাস্থি গঙ্গায় দেওয়া হইল। শব-সজ্জা-যাত্রিগণ গঙ্গাস্নান করিয়া ভগ্নমনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নগেন্দ্রনারায়ণের তখন জ্বর ১০২.৬ ডিগ্রি।

এইরূপে নগেন্দ্রনারায়ণের গৃহ শূন্য হইল। তাঁহার জীবনের সমুদয় আশা ও ভরসা ফুরাইল, জীবন মহাশ্মশানে পরিণত হইল। এরূপ অর্দ্ধাঙ্গিনী গৃহিণী যাঁহার অকালে চলিয়া যায়, একাঘাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিঃশেষিত হইয়া যায়। হায় কাল! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি পর্ব্বতকে ধূলিরাশিতে পরিণত কর, বৃদ্ধ পিতামাতার অঙ্ক হইতে তাহাদের একমাত্র পুত্রকে বিচ্ছিন্ন কর, যুবতীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ইহকাল

পরকালের আশ্রয় পতিকে তাহা হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাও, স্বামীর সুখ শান্তি আশা ভরসা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে তাঁহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ কর, সুখের সংসারকে নিমিষে শ্মশানে পরিণত কর। তোমার ক্ষমতা অসীম; শক্তি অপ্রতিহত। কাহার সাধ্য তোমার বিধানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়? দুটী পাখী এক নীড়ে শান্তি ও স্বচ্ছন্দে ভগবানের প্রসাদ ভোগ করিতেছিল, উভয়ে জগতের উপকার ব্যতীত কোন অপকার কখনও করে নাই, একি তোমার বিধান? দুটীর একটীকে তুমি সহসা কোথায় লইয়া গেলে? তুমি বড় নির্ম্মম, বড় নির্দ্দয়, বড় নিষ্ঠুর!



উপসংহার।

নগেন্দ্রনারায়ণ নিজের অসুস্থতা সত্বেও স্বর্গগতা পত্নীর মাসিক শ্রাদ্ধ-কার্য্য ভাগীরথীতীরে শোভাবাজারের রাজাদের পাকা ইমারতে সমাপন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য সৎকারকারী লোকদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। অতঃপর সুস্থ হইয়া দেশে গমন করিলেন, পরে সাংবাৎসরিক তিথিতে বৃষোৎসর্গপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি কৃত্য পূর্ণোপচারে সম্পাদন করিলেন। এখানেও সমুদয় জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়-স্বজন, প্রজা প্রভৃতিকে পরিতোষ ভোজন করাইলেন।

বসন্তকুমারীর জীবনীতে এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এদেশে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইতেই তিনি উহার পক্ষপাতিনী হ'ন। তিনি বলিতেন,—"মানুষের মানুষের প্রতি যেমন কর্ত্তব্য আছে, সেইরূপ স্বদেশের উপরও একটি সুমহৎ কর্ত্তব্য আছে। দেশকে ভালবাসিতে না পারিলে ভগবানকে ভালবাসিতে পারা যায় না।" কিন্তু তাঁহার দেশহিতৈষণায় কোনও বাহ্যাড়ম্বর ছিলনা। তাঁহার দেশভক্তি ফল্গুর ন্যায় অন্তর্নিহিত ছিল। তাহা নীরবে নিরাড়ম্বরে স্বীয় জীবন চালনায় প্রতিপদে প্রতিফলিত হইত। পার্টিসন উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, নিত্যব্যবহার্য্য বিদেশীয় জিনিষও যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিতেন না। কথায় বা তর্ক দ্বারা তিনি স্বদেশানুরাগ ব্যক্ত করিতেন না, স্বীয় জীবনে উহা দেখাইয়া আপনার জনকে শিক্ষা দিতেন।

বসন্তকুমারীর মন্ত্রদাতা গুরু, রায়ের কাটী নিবাসী—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কেশব ভারতীর সন্তান।



মৃত্যু-শয্যায় বসন্তকুমারী।

বংশের অবিলম্ব সরস্বতী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার জ্ঞাতিগণ রায় চৌধুরী বংশের দীক্ষা গুরু। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ অনেকেই মহাসাধক ছিলেন।

বসন্তকুমারী কালের আহ্বানে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মাবলী আমাদের নিকটে তাঁহাকে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিয়াছে। পত্নীপ্রাণ নগেন্দ্রনারায়ণও পত্নীর পুণ্যস্মৃতি জগৎসমক্ষে চিরস্মরণীয় রাখিতে উদাসীন নহেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা জমা দিয়া 'বসন্তকুমারী চৌধুরাণী প্রাইজ্' নামে একটী নূতন প্রাইজ্ প্রতিষ্টিত করিয়াছেন। বাখরগঞ্জজেলার অন্তর্গত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহ হইতে যে ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করতঃ ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য কোনও কলেজে সংস্কৃত একটি পাঠ্যবিষয় বলিয়া গ্রহণ করিবে, সেই ছাত্রই উহা পাইবে। ছাত্র তাহার ইচ্ছা মত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাইজ্ লইতে পারিবে। প্রতিবৎসর এক একটি ছাত্র উহা পাইবে। প্রাইজ্প্রাপ্ত ছাত্রের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকায় মুদ্রিত হইবে। এইরূপে হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী পরলোকগতা বসন্তকুমারীর স্মৃতি শিক্ষিত সমাজে চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। ইহা ব্যতীত নগেন্দ্রনারায়ণ পুণ্যবতীর স্মৃতি চিরদিন জাগরূক রাখিবার জন্য গ্রামস্থ অনাথা হিন্দু বিধবাদের সাহায্যের জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সেই সাহায্যটি "বসন্তকুমারী বৃত্তি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য নগেন্দ্রনারায়ণের ঈদৃশ কর্ত্তব্যপরায়ণতা পতিমাত্রেরই অনুকরণীয়।

সমাপ্ত।

প্রিণ্টার—আবছল গফুর
নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস,
২৪২-১, অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।